নিয়মিত প্রকাশনার ৪২ বছর

জিলহজ্ব

মাসিক মাহে জিলহজ্ব’১৪৪২ হিজরি, জুলাই-আগস্ট’২১

তরজুমান
এ’ আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত

১৫ জিলহজ্ব’ আওলাদে রসুল হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রাহ.) এর পবিত্র ওরস মোবারক

- ★ মাজমূ’আহ্- এ সালাওয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও **খাজা চৌহরভী রহমতুল্লাহি আলায়হি**
- ★ ইসলামি সংস্কৃতির উন্নয়ন ও পূনর্জীবনে গাউসে জমান আওলাদে রসুল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রাহ.)’র অনন্য অবদান
- ★ মহামানবের কোরবানী
- ★ অফুরন্ত কল্যাণ ও বরকতের আধার পবিত্র কাবাঘর
- ★ কোরবানীর জরুরী মাসায়েল

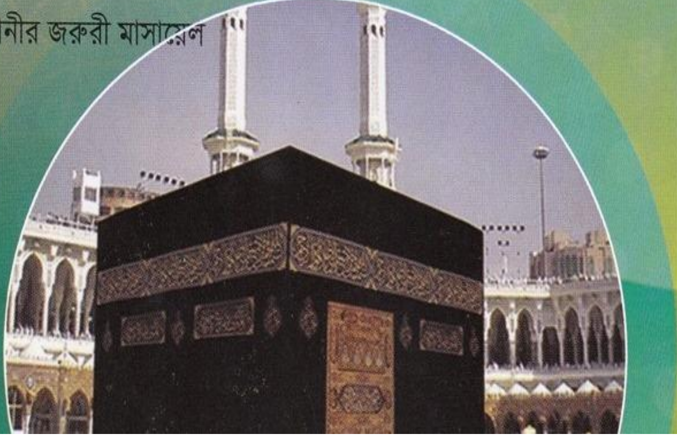

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর অত্যন্ত প্রিয় মাহবুব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম
নির্দেশিত পথ ও মত আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাত'র আক্বীদাভিত্তিক মুখপত্র

তরজুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত

মাসিক
তরজুমান
The Monthly Tarjuman

প্রতিষ্ঠাতা : রাহ্‌নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা হাফেজ ক্বারী
সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলাইহি

পৃষ্ঠপোষক : রাহ্‌নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব
সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী
রাহ্‌নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব
সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী

FOUNDER : ALLAMA ALHAJ HAFEZ QUARI SYED
MUHAMMAD TAYYAB SHAH (RA.)

PATRON : HAZRATUL ALLAMA ALHAJ SYED
MUHAMMAD TAHER SHAH (M.J.A.)
HAZRATUL ALLAMA ALHAJ SYED
MUHAMMAD SABIR SHAH (M.J.A.)

বিনিময় ২৫ টাকা

PUBLISHED BY : ANJUMAN-E-RAHMANIA AHMADIA SUNNIA TRUST
321, Didar Market, Dewan Bazar, Chittagong. Bangladesh
Phone: (+880-31) 2855976 e-mail: **info@anjumantrust.org / tarjuman@anjumantrust.org**

মাসিক

তরজুমান

৪২ তম বর্ষ □ ১২তম সংখ্যা
যিলহজ্ব : ১৪৪২ হিজরি
জুলাই-আগস্ট ২০২১, শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
monthlytarjuman@gmail.com
Website: www.anjumantrust.org
facebook.com/monthlytarjuman

লেখা, গ্রাহক, এজেন্ট ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যোগাযোগ

সম্পাদক/ম্যানেজার
মাসিক তরজুমান
৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা)
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ
ফোন: ০৩১-২৮৫৫৯৭৬, ০১৮১৯-৩৯৫৪৪৫

তরজুমানে টাকা পাঠানোর ঠিকানা
TARJUMAN -E AHLE
SUNNAT WAL JAMAT
A.C. NO. - SB/1453010001669
RUPALI BANK LTD. DEWAN
BAZAR BRANCH, CHITTAGONG,
BANGLADESH.

আন্‌জুমানের মিসকিন ফান্ড
একাউন্ট নং-১৪৫৩০-২০০০১৩২৫
চলতি হিসাব, রূপালী ব্যাংক লি.
দেওয়ান বাজার শাখা, চট্টগ্রাম

দরসে কোরআন ৪
অধ্যক্ষ মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল আলীম রিজভী

দরসে হাদীস ৬
অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

এ চাঁদ এ মাস ৯

মাজমূ‘আহ্ এ সালাওয়াতির রসূল ও খাজা চৌহরভী (রহ.) ১১
মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান

ইসলামি সংস্কৃতির উন্নয়ন ও পূণর্জীবনে গাউসে জামান আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্‌র অনন্য অবদান ১৪
মোছাহেব উদ্দীন বখতিয়ার

শরীয়তের দৃষ্টিতে হীলাহ-ই ইসক্বাত ২৪
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

‘সালেহীন’ (সৎ কর্মশীলগণ)’র গুণাবলী ও সেগুলোর প্রভাব ৩০
মাওলানা মুহাম্মদ আবুল হাশেম

মহামানবের কোরবানী ৩৬
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ আল মাসুম

অফুরন্ত কল্যাণ ও বরকতের আধার পবিত্র কাবা ঘর ৩৯
মাওলানা মুহাম্মদ মুনিরুল হাসান

প্রশ্নোত্তর ৪৩

কোরবানির জরুরি মাসায়েল ৫১

কুরআন ও সুন্নাহর প্রাতিষ্ঠানিক রূপকার আওলাদে রসূল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) ৫৫
মাওলানা আহমদুল্লাহ ফোরকান খান আলকাদেরী

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) জীবনী গ্রন্থ আলোচনা ৬৯
আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জমান

সংস্থা-সংগঠন-সংবাদ ৬২

সম্পাদকীয়

পবিত্র ইসলাম ধর্মের অন্যতম রুকন ‘হজ্ব’ । শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্যবান মুসলমানের জন্য জীবনে একবার হজ্ব সম্পাদন করা ফরজ । দুর্ভাগ্যের বিষয় বহিরাগত মুসলমানদের জন্য সৌদি সরকার এবারেও (২০২১ সালে) হজ্ব পালনে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে । মরণঘাতি কোভিড-১৯ মহামারির প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় মূলতঃ এ নিষেধাজ্ঞা । এতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মনে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে । মহামারি কখন শেষ হবে তাও কেউ বলতে পারে না । কোভিড-১৯’র মতো মহামারি কেন এল আমরা কি ভেবে দেখেছি? আল্লাহ্ তা‘আলা ও তদীয় রসূলের আনুগত্য প্রকাশ না করে নাফরমানীর মাত্রা বৃদ্ধি হবার কারণে আল্লাহ্ পাকের ‘গজব’ (মহামারি) আমাদের ওপর পতিত হয়েছে। ঈমানদার মুসলমানদের বিশ্বাসকৃত অপকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে মহান আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই । আমাদের উচিত হবে অতীতের পাপরাশির জন্য ক্ষমা চাওয়া আর ভবিষ্যতে আল্লাহর রসূল প্রদত্ত বিধানাবলী মেনে চলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে তাওবা করা । টিকা প্রতিষেধক যতোই আবিস্কার হোক না কেন তাতে কোন স্থায়ি সমাধান হবেনা নিত্য নতুন মহামারি আল্লাহর পক্ষ থেকে পতিত হবে যতোক্ষণ না আমরা পরিশুদ্ধ হই । আল্লাহ্ আমাদের ক্ষমা করুন ।

পবিত্র জিলহজ্ব মাস সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরিয়ার পীর ভাই বোন ভক্ত ও সুন্নী জনতার জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও শোকাবহ । ১ জিলহজ্ব ১৩৪২হি. বিশ্বখ্যাত আধ্যাত্মিক জগতের ‘উজ্জ্বল নক্ষত্র’ এলমে লুদুন্নিয়ার প্রস্রবণ বিশ্বের অদ্বিতীয় ও অবিস্মরণীয় দুরুদ শরীফ (ত্রিশপারা) গ্রন্থ প্রণেতা হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (রহ.) ওফাত লাভ করেন । কোনরূপ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যতীত তাত্মিক বিষয়ের মহাজ্ঞানী ও বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী মহান ব্যক্তিত্ব দিন মাযহাব মিল্লাতের দিক দর্শন বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ অবদান রেখে গেছেন । তাঁর প্রণীত ‘মাজুমু‘আয়ে সালাওয়াতে রসূল (দ.)’ ত্রিশপারা সম্বলিত কিতাবখানা বিস্ময়কর প্রতিভার এক অনুপম দৃষ্টান্ত । অভিজ্ঞ আলিম ও মুফাস্‌সির, হাদিস বিশারদগণ এ কিতাবখানা অধ্যয়ন করে বিস্ময়াভিভূত হন । একজন অনারব প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ না করেও এ রকম একটা তথ্যবহুল, অজানা অনেক রহস্য ভেদ করে প্রিয় নবীর ওপর এ বিশাল পান্ডিত্যপূর্ণ রচনা কিভাবে সম্ভব জানতে চাইলে হুজুর বলেন, ‘আমি প্রিয়নবীর নিকট হতে শুনে শুনে এ কিতাবখানা লিখেছি, সুবাহানাল্লাহ্ । এ মহাপুরুষের গুণাবলী ও জীবন চরিত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁরই প্রধান খলীফা জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া ও আনজুমান ট্রাস্ট’র প্রতিষ্ঠাতা মসলকে আলা হযরত’র নীতি আদর্শ তথা সুন্নিয়ত আন্দোলনের পথিকৃৎ কুতুবুল আউলিয়া আওলাদে রসূল, হযরত মাওলানা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.) ফরমান । তিনি তো সূর্য-সূর্য সূর্যই! তার মূল্যায়ন করা কিভাবে সম্ভব?

১৫ জিলহজ্ব সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরিয়ার অন্যতম মাশায়েখে কেরাম কুতুবুল এরশাদ, আওলাদে রসূল, হযরতুল আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)’র ওফাত দিবস । তিনি মাতৃগর্ভের অলী ছিলেন । দ্বীন-মাযহাব মিল্লাত তথা সুন্নীয়তের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর বাংলাদেশসহ এশিয়া ইউরোপ মহাদেশের বিভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ মুসলমানের প্রাণপ্রিয় মুর্শিদের ভূমিকা ও অবদান আকাশচুম্বী । শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বলে খ্যাত এ মহাপুরুষ প্রিয়নবীর শান-মান বুলন্দ করা ও সুন্নী মুসলমানদের মনে নবী-ওলী প্রেমের উৎসাহ্ -উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে শরীয়তসম্মত ব্যবস্থাপনায় এক অদৃষ্টপূর্ব জশনে জুলুছে ঈদ-এ মিলাদুন্নবী (দ.) নামকরণে ১৯৭৪ সালে এক বর্ণাঢ্য জুলুছ বের করার নির্দেশনা দেন, সাথে সাথে গাইড লাইনও প্রদান করেন । ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, না বুঝে, বুঝে বা অসংখ্য আলেম-ওলামা বুদ্ধিজীবি কঠোর সমালোচনা করে ব্যঙ্গ করলেও পরবর্তীতে সকলেই, গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা অনুধাবন করে নিজেরাই জশনে জুলুছে ঈদ-এ মিলাদুন্নবী (দ.) (১২রবিউল আউয়াল) উদযাপনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্যোগী হয়ে নিজেরাই সম্পৃক্ত হন । দেশ-বিদেশ, গ্রামে গঞ্জে ব্যাপকতা লক্ষ করা যায় । চট্টগ্রামের জুলুছে (২০১৮ইং) কোভিড পূর্ব সময়ে ধর্মপ্রাণ সুন্নী জনতা গাউসে জমান সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মু.জি.আ.)’র নেতৃত্বে ৫০/৬০ লক্ষ নবীপ্রেমিকদের সমাগম হয়েছিল । ১৯৭৭ সালে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মুখপত্র তরজুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত’ শীর্ষক একটি মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন । ১৯৮৬ সালে গাউসিয়া কমিটি প্রতিষ্ঠা করেন আনজুমান ট্রাস্ট’র অঙ্গ সংগঠন হিসেবে। দ্বীন ও মিল্লাত’র খেদমত করার পাশাপাশি দূর্যোগকালীন সময়ে বিশেষ করে বর্তমান করোনাকালীন সময়ে গাউসিয়া কমিটির ভূমিকা প্রশংসনীয় । গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ আজকে মানুষের কাছে মানবতার সংগঠন হিসেবে মনে করছে, গণমানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে ।

আমাদের প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরিয়ার দুই মহান দিকপাল হযরত খাজা চৌহরভী (রহ.) ও হযরত হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)’র প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন ও তাঁদের ফুয়ূজাত কামনা করছি ।

আল্লাহ্-রসূল বিরোধীরাই চির লাঞ্ছিত

অধ্যক্ষ হাফেজ কাজী আবদুল আলীম রিজভী

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمۡ عَذَابًا شَدِيۡدًا ؕ اِنَّهُمۡ سَآءَ مَا كَانُوۡا
يَعۡمَلُوۡنَ (١٥) اِتَّخَذُوۡۤا اَيۡمَانَهُمۡ جُنَّةً فَصَدُّوۡا عَنۡ
سَبِيۡلِ اللّٰهِ فَلَهُمۡ عَذَابٌ مُّهِيۡنٌ (١٦) لَنۡ تُغۡنِىَ عَنۡهُمۡ
اَمۡوَالُهُمۡ وَلَاۤ اَوۡلَادُهُمۡ مِّنَ اللّٰهِ شَيۡـئًا ؕ اُولٰٓئِكَ
اَصۡحٰبُ النَّارِ ؕ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ (١٧) يَوۡمَ يَبۡعَثُهُمُ
اللّٰهُ جَمِيۡعًا فَيَحۡلِفُوۡنَ لَهٗ كَمَا يَحۡلِفُوۡنَ لَكُمۡ
وَيَحۡسَبُوۡنَ اَنَّهُمۡ عَلٰى شَىۡءٍ ؕ اَلَاۤ اِنَّهُمۡ هُمُ
الۡكٰذِبُوۡنَ (١٨) اِسۡتَحۡوَذَ عَلَيۡهِمُ الشَّيۡطٰنُ فَاَنۡسٰهُمۡ
ذِكۡرَ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزۡبُ الشَّيۡطٰنِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ حِزۡبَ
الشَّيۡطٰنِ هُمُ الۡخٰسِرُوۡنَ (١٩) اِنَّ الَّذِيۡنَ يُحَآدُّوۡنَ
اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗۤ اُولٰٓئِكَ فِى الۡاَذَلِّيۡنَ (٢٠)

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়

তরজমাঃ (মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন) আল্লাহ্ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। নিশ্চয় তারা যা করে খুবই মন্দ। তারা নিজেদের শপথসমূহকে ঢাল স্বরূপ গ্রহণ করে নিয়েছে। অতঃপর তারা আল্লাহর পথে (মানুষকে) বাধা প্রদান করেছে। সুতরাং তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর আযাব থেকে মোটেও তাদের বাঁচাতে পারবে না। তারা আগুনের অধিবাসী। তথায় তারা স্থায়ীভাবে থাকবে। যেদিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন। তখন তাঁর (অর্থাৎ আল্লাহর) সম্মুখেও তারা তেমনই শপথ করবে, যেমন তোমাদের সামনে শপথ করেছে এবং তারা একথা মনে করছে যে, তারা কিছু করেছে। সাবধান, নিশ্চয় তারাই তো মিথ্যাবাদী, শয়তান তাদের উপর বিজয়ী হয়েছে। সুতরাং সে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহর স্মরণ। তারা শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত। নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরন করে তারা সর্বাধিক লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভূক্ত।

[সূরা আল-মুজাদালাহ্, আয়াত-১৫-২০]

আনুষঙ্গিক আলোচনা

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمۡ عَذَابًا شَدِيۡدًا ؕ الخ...

মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী ‘আল্লাহ্ তাদের অর্থাৎ মুনাফিকদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।’

এর ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সেরিনে কেরাম উল্লেখ করেছেন, উদ্ধৃত আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মুনাফিক্বদেরকে কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন। যারা দিনের বেলায় প্রকাশ্যে মু’মিনগণের সঙ্গে মেলামেশা ও সামাজিকতা রক্ষা করে। আর গোপনে অপ্রকাশ্যে কাফের-মুশরিকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতাপূর্ণ সুসম্পর্ক বজায় রাখে অথচ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে কাফের মুশরিক বেদ্বীনগণের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা হারাম ও কুফরী। (নাউযুবিল্লাহ্)

কুরআনে করীমের পূর্ণাঙ্গ সূরা ‘আল-মুনাফিক্বূন’ এবং ‘আল-বাক্বারা’র প্রারম্ভিক وَمِنَ النَّاسِ مَنۡ يَّقُوۡلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ الخ.. হতে পরপর তের আয়াত অবতীর্ণ করণসহ আরো বিভিন্ন সূরা আয়াত অবতীর্ণ করে আল্লাহ্ জগৎবাসীর সামনে মুনাফিকদের প্রকৃত ও পরিপূর্ণ স্বরূপ উন্মোচন করে দিয়েছেন। যাতে মু’মিনগণ তাদের বিষয়ে সতর্ক ও সচেতন হয়। এরা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য ঘরের শত্রু স্বরূপ। প্রকাশ্য কাফের-মুশরিক, ইহুদীগণের চেয়ে বেশী ক্ষতিকর ও ভয়ঙ্কর।

তাই আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ্ যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, লালনকর্তা, সর্বচাহিদার সংস্থানকর্তা, বিচারকর্তা ও প্রতিফল দাতা, তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেছেন কঠিন শাস্তির। এটা এক প্রকারের تهديد তথা ভীতি প্রদর্শন। যাতে তারা এদের ঈমান-আক্বীদা পরিপন্থী ও আখেরাত বিধ্বংসী পাপাচার থেকে তাওবা করে বিরত থাকে।

ইসলাম পরকাল বিশ্বাস নির্ভর জীবন ব্যবস্থা, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন চরম ও পরম সহনশীল। জাগতিক জীবনে বান্দার হাতে ইচ্ছানুযায়ী কর্ম সাধনার সুযোগ ও ইখতেয়ার সোপর্দ করা হয়েছে। প্রতিদান-ফলাফল আখেরাতে প্রদত্ত হবে। পাপী-তাপী, অপরাধীদের তৎক্ষণাৎ পাকড়াও ও করা হয় না বরং অবকাশ দেয়া হয়। যাতে তারা অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্-রসূলের আনুগত্যে ফিরে আসে এ প্রত্যাশায়। কিন্তু শয়তানী প্ররোচনায় মোহাচ্ছন্ন হয়ে বান্দা এতেই গোমরাহ্ ও পথভ্রষ্ট হয়।

لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ...

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সেরীনে কেরাম উল্লেখ করেছেন মুনাফিকদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে মোটেও রক্ষা করতে পারবে না। যাদের ভরসায় তারা জাগতিক জীবনে আল্লাহ্-রসূলের উপর ঈমান আনয়ন ও আনুগত্য করা থেকে বিরত রয়েছে।

উল্লেখ থাকে যে, যেসব বিষয় মানবকুলকে আল্লাহ্-রসূলের স্মরণ ও আনুগত্য হতে বিভ্রান্ত-বিমুখ করে তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ দু'টি বস্তু-ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। তাই কুরআনে করীমের বিভিন্ন সূরায় অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন কাফির-মুশরিক, মুনাফিকদেরকে সম্পদ ও সন্তানের বিষয় উল্লেখ করে ভয় প্রদর্শন করেছেন। যার ভরসায় ও অহংকারে তারাও আল্লাহ্-রসূল আখেরাতের উপর ঈমান আনয়ন করেন বরং ঈমান-ইসলামের প্রচার-প্রসারের প্রতিরোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছে। সম্পদ-সন্তানের অহংকারে মত্ত হয়ে নিরীহ্ মুমিন-মুসলিমের উপর জুলুম-জ্বালাতনের স্টীম রোলার চালিয়েছে ধনবল ও জনবলে বলীয়ান হয়ে এসব সম্পদ কিংবা সন্তানাদি তাদেরকে পার্থিব বা পারলৌকিক জীবনের কোন অবস্থায় কোনরূপ আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারবেনা। যেমন, রক্ষা করতে পারেনি অভিশপ্ত ফেরআউন, কারুন, হামান, নমরূদকে আল্লাহর আযাব-গযব থেকে। বাঁচতে পারেনি আল্লাহর সাজা-শাস্তি হতে আরবের অভিশপ্ত আবূ জাহেল, আবূ লাহাব কিংবা মুনাফিক্বরা। স্মর্তব্য যে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মহব্বত সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় ও বর্জনীয় নয়, বরং এগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকা কোন কোন অবস্থায় কেবল জায়েজই নয় ওয়াজিবও হয়ে যায়। সম্পদ আর সন্তানাদি যদি ঈমান-ইসলামের প্রচার-প্রসারের বড় অবলম্বনে পরিণত হয় আল্লাহ্-রসূলের নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের নিশ্চিত ওয়াসিলায় গণ্য হয় এবং দিকরজনী, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বাবস্থায় মানব কল্যাণে ও সমাজ উন্নয়নে ব্যয় হয়, তবে তা মহান আল্লাহর বড় নেয়ামত। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, অর্থ-বিত্তের অধিকারীরাই একমাত্র হজ্ব-যাকাতের ন্যায় ফরয ইবাদত আদায়ের সৌভাগ্য অর্জনে ধন্য হয়। আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ আর ক্ষুধার্তের মুখে অন্নের সংস্থান এর সুযোগ সম্পদশালীরাই লাভ করে থাকে। তাই সম্পদ আর সন্তানাদি মুমিনের জন্য পার্থিব-পারলৌকিক উভয় জীবনে কল্যাণকর। [তাফসীর-ই কুরতুবী ও নুরুল ইরফান]

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ...

উদ্ধৃত আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সেরিনে কেরামে উল্লেখ করেছেন যে, ইজ্জত আর লাঞ্চনার মালিক একমাত্র আল্লাহ। وتعز من تشاء وتذل من تشاء তাই ইজ্জত লাভের এবং লাঞ্চনা থেকে মুক্তির মানদন্ড হলো আল্লাহ্-রসূলের উপর ঈমান ও সামগ্রিক জীবনে আনুগত্য। এর কোন বিকল্প নেই। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে পার্থিব জীবনের সর্বক্ষেত্রে তারাই চির লাঞ্চিত, অপদস্থ। মহান আল্লাহ্ সকলকে আমল করার তাওফিক দিন। আমিন।

লেখক: অধ্যক্ষ-কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদরাসা, মুহাম্মদপুর এফ ব্লক, ঢাকা।

দরসে হাদীস

হাজরে আসওয়াদ ও মাক্বামে ইবরাহীম আল্লাহর কুদরতী নিদর্শন

অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভি

عَنْ بْدِ اللهِ بن عَمَرَ رَضِیَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْحَجْرَ وَالْمَقَامَ يَاقُوْتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الجَنَّةِ طَمَسَ اللهُ نُوْرُهمَا لَوْلَا ذَالِكَ لَاضَاءَتَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَوْمَا بَيْنَ الْمشرقِ وَالْمَغْرِبْ -

(مسند احمد ۲/۲۱۴- صحيح ابن خزيمه)

অনুবাদঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, হাজরে আসওয়াদ এবং মাক্বামে ইবরাহীম জান্নাতের ইয়াকুত পাথর সমূহের দুটি ইয়াকুত পাথর আল্লাহ্ তা'আলা এর নূরকে নিস্প্রভ করে দিয়েছেন যদি এ দুটি পাথরের নয়র নিস্প্রভ না করতেন তাহলে পূর্ব দিকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত আলোকিত হয়ে যেতো।

[মুসনাদে আহমদঃ ২/২১৪ সহীহ ইবনে খুজায়মাঃ হাদীস নম্বর ২৭৩১, তারিখে মক্কা মুকার্‌রমাঃ পৃষ্ঠা ৬৮, তিরমিযী শরীফ খণ্ড. ২, পৃষ্ঠা ২৪৮, হাদীস নম্বর ৮৭৯, বাহারে শরীয়তঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৯২]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বর্ণিত হাদীস শরীফে দুটি জান্নাতি পাথরের গুরুত্ব আলোকপাত হয়েছে। পবিত্র ক্বোরআন মজীদ ও অসংখ্য হাদীস শরীফের আলোকে এ পাথর দুটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। এগুলো আল্লাহর কুদরতী নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। ক্বাবা কেন্দ্রিক আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দ্ধারিত পবিত্র নিদর্শনাদির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাকে তাকওয়ার পরিচায়ক বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ

অর্থঃ যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে নিঃসন্দেহে তা অন্তরের তাকওয়া থেকেই। [সূরা হজ্বঃ আয়াত- ৩২]

পবিত্র ক্বোরআনের আলোকে আল্লাহর কুদরতী নিদর্শন

বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর ক্বিবলা বাইতুল্লাহ্ তথা ক্বাবা শরীফকে কেন্দ্র করে পূণ্যভূমি মক্কা মুকার্‌রামায় রয়েছে আল্লাহ্‌র অসংখ্য কুদরতী নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ

অর্থঃ সেটার মধ্যে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি রয়েছে, ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থান। [সূরা আল-ইমরানঃ আয়াত ৯৭]

বণির্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত তাফসীরকারক হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি প্রণীত তাফসীর নুরুল ইরফানে উল্লেখ রয়েছে, এতে রয়েছে বহু বরকতময় নিদর্শন, যেমন মাক্বাম-ই ইবরাহীম, হাজরে আসওয়াদ, সাফা মারওয়া, রুকনে ইয়ামীন, আরাফাত, মিনা ইত্যাদি।

আল ক্বোরআনে মাক্বামে ইবরাহীমের বর্ণনা

মাক্বাম-ই ইবরাহীম এমন এক জান্নাতি পাথর যে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম ক্বাবা শরীফ নির্মাণ করেছেন। এ পাথরে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর গভীর পদচিহ্ন অদ্যাবধি বিদ্যমান। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম ক্বাবা শরীফ নির্মাণকালে ক্বাবা ঘরের দেওয়ালগুলোর উচ্চতা অনুসারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এ পাথর উপরের দিকে উঠে যেতো। এবং নীচে অবতরণের সময় পাথর নীচে মেনে যেতো। একটি জড় পাথরের পক্ষে প্রয়োজনানুসারে উঁচু নীচু হওয়া ও মোমের মতো নরম হয়ে আল্লাহর নবীর পদচিহ্ন নিজের মধ্যে ধারণ করা আল্লাহ্‌র অপার কুদরতের নিদর্শন। বাইতুল্লাহ্ শরীফ সাতবার তাওয়াফের পর হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করে বাইতুল্লাহ্ শরীফ ও মাক্বামে ইবরাহীমকে সামনে রেখে দু'রাকাত নামায পড়া ওয়াজিব। একে তাওয়াফের নামায বলা হয়। পবিত্র ক্বোরআনে এরশাদ হয়েছে-

وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

আর ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ করো। [সূরা বাক্বারা: আয়াত ১২৫]

এ দু'রাকাত ওয়াজিব নামাযের প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরুন দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস পাঠ করবে। যদি সেখানে নামাযের জায়গা পাওয়া না যায় হাতিমের ভিতরে অথবা মাতাফের যেখানে জায়গা পাওয়া যাবে সেখানে উক্ত নামায পড়লে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। [আলমগীরি ১ম খণ্ড]

হাদীস শরীফের আলোকে মাক্বামে ইবরাহীমে নামায

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মক্কায় আগমন করে বাইতুল্লাহ্র তাওয়াফ করেন এবং মাক্বামে ইবরাহীমের পেছনে দু'রাকাত নামায আদায় করেন এবং সাফা মারওয়ার মাঝে সাতবার সাঈ করেন।

[বুখারী শরীফ, ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার কৃত: মুফতি সাইয়্যেদ আমিনুল ইহসান (রাহ.)]

মাক্বামে ইবরাহীম সম্মানিত হওয়ার কারণ

মাক্বামে ইবরাহীম পাথরটিতে আল্লাহ্র নবী হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর কদম শরীফ স্পর্শ হওয়ার কারণে সেটা মর্যাদা মন্ডিত হয়েছে। মাক্বামে ইবরাহীমের প্রতি নামাযে সম্মান প্রদর্শন করা আল্লাহর নবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নামান্তর। এ সম্মান নামাযকে ক্রুটিপূর্ণ করবে না বরং নামাযকে পরিপূর্ণ করবে। প্রতীয়মান হলো পাথর নবীর কদম স্পর্শ হওয়ার কারণে যদি সম্মানিত হয়ে যায়, তাহলে নবীজির পবিত্র বিবিগণ ও সাহাবায়ে কেরাম এবং নবীজির পবিত্র বংশধরগণের মর্যাদা কতো বেশী হতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

[তাফসীরে নুরুল ইরফান: ১ম খণ্ড]

মাক্বামে ইবরাহীমের অবস্থান

ক্বাবা শরীফের পূর্বদিকে সোনালী ফ্রেমে যে প্রস্তরখণ্ড সংরক্ষিত আছে তাকে মাক্বামে ইবরাহীম বলে। চার হাজার বছরের অধিককাল অতিবাহিত হওয়ার পরও হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর কদম মোবারক'র চিহ্ন এখনো অপরিবর্তিত রয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত তা অপরিবর্তিত থাকবে। প্রতিটি পায়ের ছাপের দৈর্ঘ্য ২৭ সেন্টিমিটার প্রস্ত ১৪ সেন্টিমিটার দুই পায়ের মধ্যে ব্যবধান প্রায় এক সেন্টিমিটার। পাথরটিতে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর পায়ের চিহ্নের গভীরতা পাথরটির উচ্চতার অর্ধেক ৯ সেন্টিমিটার। এটি দুআ কবুলের স্থান।

হাজরে আসওয়াদ জান্নাতি পাথর

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত-

ن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم نزل الحجر الاسود من الجنةِ وهو اشدّ بَيَاضًا
من اللبنِ فسودته خطايا بنى ادم- (رواه الترمذى والدارمى)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথরটি) জান্নাত থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। সেটা দুধের চেয়েও অধিক সাদা ছিল, আদম সন্তানের গুনাহ্ সেটাকে কালো বানিয়ে দিয়েছে।

[তিরমিযী শরীফ: ২য় খণ্ড, ২৪৮, হাদীস নম্বর ৮৭৮, বাহারে শরীয়ত: ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৯২]

হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা ও চুমু দেওয়া নবীজির সুন্নাত

ابن عُمَرَ رَضِىَ الله عنهما اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ اِسْتِلَامِ
الْحَجَرِ فَقَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم
يُسَلِّمه ويُقَبِّلُهُ- (رواه البخار)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমাকে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করার বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি তিনি তা স্পর্শ করেছেন ও চুম্বন করেছেন।

[বুখারী শরীফ, ফিকহুস্ সুনানি ওয়াল আছার: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০২]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন-

ما تركته منذ رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله -

(رواه مسلم)

আমি যখন থেকে হাজরে আসওয়াদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে চুম্বন করতে দেখেছি তখন থেকে আমি সেটাতে চুম্বন করা ত্যাগ করিনি।

[সহীহ মুসলিম শরীফ: হাদীস নম্বর ১২৬৮, তারিখে মক্কা মুকার্‌রমা: পৃষ্ঠা ৬৯]

কিয়ামতের দিবসে হাজরে আসওয়াদ সাক্ষ্য দিবে

عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحجر والله يبعثه اللهُ يَوْمَ الْقيامة لهُ عَينَانِ يُبصر بهما ولسان ينطقُبه يشهد على من استلمه بحق (رواه الترمذى وابن ماجه والدارمى)

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাজরে আসওয়াদ সম্বন্ধে এরশাদ করেছেন, আল্লাহর শপথ আল্লাহ্ সেটাকে কিয়ামত দিবসে এমনভাবে উঠাবেন যে, সেটার দুটি চক্ষু থাকবে যে চক্ষুদ্বয় দিয়ে সে দেখতে পাবে। একটি জিহ্বা থাকবে যা দিয়ে কথা বলবে। চুম্বনকারীদের পক্ষে সত্য সাক্ষ্য দিবে।

[তিরমিযী, ইবনে মাযাহ্, দারেমী শরীফ]

প্রতীয়মান হলো, এ পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষ সেটাকে চুম্বন করেছে, সেটা তাদের সবাইকে জানে ও চিনে। এমনকি মু'মীনের অন্তরের ইখলাস ও মুনাফিকদের নিফাক সম্পর্কেও অবগত।

[মিরআতুল মানাজীহ ৪র্থ খণ্ড কৃত: হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমী (রাহ.)]

হাজরে আসওয়াদ কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে

উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে হাজরে আসওয়াদের নিকট উপস্থিত হবে, সেটা কিয়ামতের দিন তাকে সুপারিশ করবে।

[দুররে মনছুর, কানযুল উম্মাল: খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ৯৮, আনোয়ারুল বায়ান: খণ্ড ৩৩, পৃষ্ঠা ২৮৩]

লেখক: *অধ্যক্ষ- মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (ডিগ্রী), হালিশহর, বন্দর, চট্টগ্রাম।*

মাহে যিল্হজ্ব

পবিত্র হজ্ব, কোরবানি ও ঈদুল আজহার মহান সওগাত নিয়ে সম্মানিত মাস মাহে যিল্হজ্ব আমাদের দ্বারে উপস্থিত। এ মাস হিজরী বর্ষের শেষ মাস হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ।

হাদীস শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ পাক দিবস সমূহের মধ্যে চারটি দিবসকে সম্মানিত করেছেন- জুমার দিন, আরাফার দিন, ঈদুল আজহার দিন এবং ঈদুল ফিতরের দিন। তদ্রুপ চারটি মাসকে মর্যাদাপূর্ণ করেছেন- ১. জিলক্বদ, ২. জিলহজ্ব, ৩. মহর্‌রম, ৪. রজব।

এ মাসের নফল ইবাদত

এ মাসের নতুন চাঁদ উদিত হবার পর যে ব্যক্তি দু'রাকাত করে চার রাকাত নফল নামায (প্রতি রাকাতে পঁচিশ বার করে সূরা ইখলাস দ্বারা) আদায় করবে তার জন্য অগণিত সওয়াবের কথা হাদিস শরীফে উল্লেখ রয়েছে। *এ মাসে ১ তারিখ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত রোযা রাখা অত্যন্ত বরকতময় মুস্তাহাব।*

বিশেষত ৯ যিলহজ্ব ইয়াওমে আরাফা অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ দিন। এ দিন রোযা আদায়ে বহু সাওয়াব রয়েছে।

এ মাসের ১০ম রাতে বিতর নামাযের পর দুই রাকাত করে চার রাকাত নফল নামায আদায় করবেন। এর প্রতি রাকাতে সূরা কাউছার (ইন্না আ'ত্বায়নাকাল কাউছার) তিনবার এবং সূরা ইখলাস (কুলহুয়াল্লাহু আহাদ) তিনবার করে পড়বেন।

এ মাসের যে কোন রাতের শেষ অধ্যায়ে প্রতি রাকাতে তিনবার আয়াতুল কুরসী, একবার সূরা ফালাক্ব এবং সূরা নাস দ্বারা চার রাকাত নামায আদায় করবে। অতঃপর দু'হাত তুলে নিম্নের দো'আটি পাঠ করবেন।

সুবহানা যিল ইজ্জাতি ওয়াল জাবারূত, সুবহানা যিল কুদরাতি ওয়াল মালাকূত, সুবহানা যিল হাইয়্যিল লাযী লা য়ামূতু, লা ইলাহা ইল্লা হুয়া ইউহয়ী ওয়া য়ূমীতু ওয়াহুয়া হাইয়্যুন লা য়ামূতু সুবহানাল্লাহি রাব্বিল ইবাদি ওয়াল বিলাদি, আল্হামদু লিল্লাহি কাছীরান তাইয়্যিবাম মুবারাকান আলা কুল্লি হাল। আল্লাহু আকবর কাবীরান, রাব্বানা ওয়া জাল্লাজালালাহূ ওয়া কুদরাতাহূ বিকুল্লি মকান।

এরপর আল্লাহর নিকট স্বীয় প্রার্থনা নিবেদন করলে ইন্শাআল্লাহ কবুল হবে। এ নামায ও দোয়ার আমল একবার আদায় করলে হজ্ব ও মদীনা তাইয়্যিবাহ যিয়ারতের সওয়াব পাওয়া যাবে। আর প্রথম দশ রাতে নিয়মিত আদায় করলে জান্নাতুল ফিরদাউস অবধারিত এবং এক হাজার পাপ মার্জনা করা হবে।

তাকবীরে তাশরীক

এ মাসের ৯ তারিখ ফজর নামায হতে ১৩ তারিখ আসর ওয়াক্তের ফরজ নামায পর্যন্ত প্রতি নামাযের পর নিম্নের তাকবীর পাঠ করতে হবে এবং ভুলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্র পাঠ করে নেবে।

তাকবীর: ***আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ।***

ঈদুল আজহার রজনীটি আল্লাহ্‌র করুণা লাভের পঞ্চরাত্রির অন্যতম। এ রাতে বিনিদ্র থেকে নফল ইবাদতের মাধ্যমে রাত অতিবাহিত করার মধ্যে অশেষ কল্যাণ ও সাওয়াব নিহিত রয়েছে।

এ মাসে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট আউলিয়া কেরাম

০১ যিলহজ্ব : খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (রাহ.)।
০১ যিলহজ্ব : হযরত শাহ্সূফী আমানত খান (রাহ.)।
০৭ যিলহজ্ব : হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাকের (রাহ.)।
০৮ যিলহজ্ব : ইমাম মুসলিম ইবনে আকিল (রাদ্বি.)।
০৮ যিলহজ্ব : হযরত ইমাম আবু যর গিফারী (রাহ.)।
১০ যিলহজ্ব : হযরত হাফেজ মুহাম্মদ বজলুর রহমান (রাহ.)
১৫ যিলহজ্ব : হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রাহ.)।
১৭ যিলহজ্ব : হযরত ইমাম আবু বকর শিব্লী (রাহ.)।
১৮ যিলহজ্ব : হযরত নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (রাহ.)
১৯ যিলহজ্ব : মাহ্বূবে ইলাহী হযরত নিযামুদ্দীন (রাহ.)।
২৬ যিলহজ্ব : হযরত খান জাহান আলী (রাহ.)।

আগামী চাঁদ আগামী মাস : মাহে মুহর্‌রম

হিজরীবর্ষ সূচনাকারী সম্মানিত মাস মুহর্‌রম বিভিন্ন তাৎপর্য এবং ইতিহাসের বহু প্রসিদ্ধ ঘটনার ধারক। পৃথিবীর আদি হতে বহু স্মৃতিকে এ মাস স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশেষত- এ মাসের দশম তারিখটিতে বহু ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, যা ইতিহাসে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও কিছু ঘটবে বলে হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে।

১০ মুহর্‌রম বা আশুরা দিবসে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম'র দোয়া কবুল, হযরত আদম, হযরত হাওয়া, হযরত ইব্‌রাহীম ও হযরত ঈসা আলায়হিমুস্ সালাম'র জন্ম, হযরত এয়াকুব আলায়হিস্ সালাম'র সাথে হযরত ইউসুফ আলায়হিস সালাম'র মিলন, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম ও তাঁর কউমকে নীলনদ হতে পরিত্রাণ এবং ফেরআউন ও তার সৈন্যদের সলিল সমাধি, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলার সৌভাগ্য এবং তাওরাত কিতাব লাভ, হযরত নূহ আলায়হিস সালাম'র সময়ে মহাপ্লাবনের পর সঙ্গীদের নিয়ে নৌকা হতে ভূমিতে অবতরণ, হযরত ইদ্রীস আলায়হিস্ সালাম ও হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামকে আসমানে উত্তোলন, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা'র শাদী মুবারক এবং হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র ফোরাত নদীর তীরে কারবালা প্রান্তরে সপরিবারে শাহাদাত বরণ প্রভৃতি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আশুরা তারিখে কোন এক শুক্রবার মহাপ্রলয়ে পৃথিবীর ধ্বংস ঘটবে। এ দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের জন্য মাতম ও আহাজারীর পরিবর্তে ক্বোরআন সুন্নাহসম্মত কতিপয় আমল নিম্নে পেশ করা হলো।

আমল

আশুরা দিবসে ইবাদতের নিয়তে গোসল করলে জীবনে কুষ্ঠ রোগ হতে মাহফুজ থাকবে। এই দিন এবং তার পূর্ববর্তী দিনসহ রোযা পালন, পরিবার পরিজনসহ উন্নত খাদ্যের আয়োজন করে শুকরিয়া আদায়, খিচুড়ি বা হালিম জাতীয় আহার্য তৈরি করে ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং শহীদানে কারবালার জন্য ঈসালে সওয়াবের ব্যবস্থা, চোখে সুরমা ব্যবহার, সামর্থানুযায়ী দান-খায়রাত, ওয়াজ-নসীহতের ব্যবস্থা ইত্যাদি অত্যন্ত পুণ্যময় কাজ।

মহর্‌রম মাসের ১ তারিখে দু'রাকাত নামায আদায় করা যায়। সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস তিনবার করে পড়বেন। এরপর দু'আটি পাঠ করলে সারা বৎসর শয়তানের প্ররোচনা হতে রক্ষা পাবেন এবং ইবাদতে একনিষ্ঠতা হাসিল হবে।

দু'আ

আল্লা-হুম্মা আনতাল আবারুল্লুল কদী-ম, ওয়াহা-জিহী ছানাতুল জাদী-দাহ, ইন্নী- আসআলুকা ফী-হাল ইসমাতা, মিনাশ শায়তা-নির রাজী-ম ওয়া আউলিয়া-ইশ শায়তা-ন, ওয়ামিন শার্‌রিল বালা-য়া- ওয়াল আ-ফা-ত, ওয়াল আউনা হা-জিহিন নাফসিল আ-খিরাতি বিস্‌সূ-ই ওয়াল ইশতিগা-লা বিকা ইউক্বার্‌রিবুনী- ইলাইকা, ইয়া-যালজালা-লি ওয়াল ইক্‌র---ম।

আশুরার দিনে দুই রাকাত করে চার রাকাত নামায আদায় করবেন। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার সূরা যিল্‌যাল, একবার কাফিরূন ও একবার সূরা ইখলাস পড়বেন। নামায শেষে কমপক্ষে একশত বার দরূদ শরীফ আদায় করবেন। অন্য এক বর্ণনা মোতাবেক আরো চার রাকাত নামাযের নিয়ম পাওয়া যায়। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে পঞ্চাশবার করে সূরা ইখলাস পাঠ করতে হবে।

রোযা

এ মাসে প্রথম দশদিনে রোযা রাখার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এমনকি অন্ততপক্ষে একটি রোযা পালনের জন্য হাদীস শরীফে তাগিদ দেয়া হয়েছে।

তেলাওয়াত

এ মাসে অধিকহারে ক্বোরআন তিলাওয়াত ও দুরূদ শরীফ পাঠ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। বিশেষত- আশুরা দিবসে কমপক্ষে দশটি আয়াত তিলাওয়াত কারীর জন্য সমুদয় ক্বোরআন শরীফ খতম করার সওয়াব দেয়া হবে বলে উল্লেখ রয়েছে। আমাদের উচিত এ মাসটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিপালন, আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত সকল ক্ষেত্রে হিজরী সাল ও তারিখের গুরুত্ব প্রতিফলন। ব্যক্তিক ও সামাজিক সকল ক্ষেত্রে ধর্মীয় মূল্যবোধের অনুবর্তন করার জন্য সচেষ্ট হওয়া নববর্ষের সূচনাতে আমাদের সে কামনাই থাকবে।

মাজমূ‘আহ্-এ সালাওয়াতির রসূল (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ও খাজা চৌহরভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি

মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে মানব জাতির হেদায়তের জন্য অসংখ্য নবী-রসূল, গাউস, আবদাল ও অগণিত আউলিয়া কেরাম দুনিয়াতে প্রেরণ করেন। যাদের নিরলস পরিশ্রম, ত্যাগ, কোরবানী, সাধনা এবং উত্তম আদর্শের মাধ্যমে হক, ন্যায়, আল্লাহর সুমহান বাণী ও আদর্শ পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে। যার কারণে তাদের সে প্রচেষ্টায় আজ অবধি পৃথিবীর বুকে উড্ডীন রয়েছে ঈমান-ইসলামের ঝান্ডা। তাদেরই একজন ছাহেবে এলমে লাদুন্নি, খাজায়ে খাজেগান মারেফাতে ইলাহীর অন্যতম ধারক ও বাহক সৈয়দুনা খাজা আব্দুর রহমান চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি। হুযুরে পুরনূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং পীরানে পীর দস্তগীর, গাউসুল আযম, সৈয়দুনা শায়খ সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির আধ্যাত্মিক নেয়ামতের একদিকে প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন, অপরদিকে সুন্নাতে নববীর পরিপূর্ণ পাবন্দ এবং শরীয়ত, তরিকত ও মারেফাতের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। যার ইলমে লাদুন্নির প্রস্রবণ হলো আজ বিশ্বের অদ্বিতীয় অতুলনীয় ত্রিশ পারা দরুদ শরীফের গ্রন্থ ‘মাজমূ‘আহ্-এ সালাওয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, যা নবী প্রেমের জ্বলন্ত নিদর্শন। তিনি কত উচুঁ মাপের আধ্যাত্মিক ওলী ছিলেন তা বর্ণনা দিয়ে শেষ করা যাবে না। শুধুমাত্র এতটুকু যথেষ্ট মনে করি যার আধ্যাত্মিক জগতের শিষ্য এবং খলিফায়ে আযম হলেন আওলাদে রসূল, গাউসে জামান, কুতুবুল আউলিয়া, হাফেজ ক্বারী আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি। পাক-ভারত উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ দ্বীনী সুন্নি বিদ্যাপীঠ, এশিয়া বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা নিকেতন বাংলার আজহার জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়ার প্রতিষ্ঠাতা।

ইলমে লাদুন্নির মহান ধারক খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ১২৬২ হিজরীতে (১৮৪৩ ইংরেজী সালে) সীমান্ত প্রদেশের হাজারা জিলার হরিপুর শহরের নিকটবর্তী ‘চৌহর শরীফে’ জন্মগ্রহণ করেন। যা বর্তমানে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। তাঁর পিতার নাম হযরত খাজা ফকির মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলায়হি। যিনি হযরত খিজির আলায়হিস্ সালামের ‘দর্শন’ লাভে সৌভাগ্যবান হন। তাই তাঁকে খিজিরী উপাধিতে ভূষিত করা হয়। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি সম্মানিত পিতাকে হারান। স্বল্পভাষী খাজা চৌহরভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি শৈশবকাল থেকেই আধ্যাত্মিক কর্মকান্ডে লিপ্ত ছিলেন। রুবুবিয়াত ও রহমানিয়াতের রঙে তাঁর কার্যাদি ছিল সম্পূর্ণরূপে রঞ্জিত। আর জীবন দর্শন ছিল রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামার আদর্শ ও নীতির বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তিনি ছিলেন একাধারে তাসাউফপন্থীদের সরতাজ, মাআরেফে লাদুন্নিয়ার প্রস্রবণ, উলুমে ইলাহিয়ার ধারক। সাথে সাথে সন্দেহাতীতভাবে আপন যুগের ‘গাউসে জামান’ ছিলেন। জাহেরীভাবে খাজা আব্দুর রহমান চৌহরভী কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ না করলেও, তিনি ছিলেন ইলমে লাদুন্নির পরিপূর্ণ ধারক-বাহক। যার প্রমাণ তাঁর রচিত ত্রিশ পারা ‘দরুদ শরীফের’ গ্রন্থ মাজমুয়ায়ে সালাওয়াতির রাসূল (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)। এ মহান সাধক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামার শানে ও প্রেমে বিভোর হয়ে রচনা করেন বিশ্বের অদ্বিতীয় গ্রন্থ, ত্রিশ পারা সম্বলিত ‘দরুদ শরীফ’ সম্বলিত কিতাব ‘মুহায়য়িরুল উকুল ফি বয়ানে আওসাফ-ই আকলিল উকুল ‘মাজমুয়ায়ে সালাওয়াতির রাসূল সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।’ প্রায় সুদীর্ঘ ১৩ বছর অর্থাৎ ১২ বছর ৮ মাস ২০ দিন সাধনার পর ৩০ পারা বিশিষ্ট প্রতি পারায় ৪৮ পৃষ্ঠা করে ১৪৪০ পৃষ্ঠার বিশাল এ দরূদ শরীফের কিতাবখানা সম্পন্ন করেন। আলহামদুলিল্লাহ্ অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হচ্ছে যে এটি বর্তমানে উর্দু ও বাংলায় অনুবাদ হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। যেখানে ৬৬৬৬টি দরুদ শরীফ রয়েছে। এ বিশাল কিতাব রচনা প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, ‘আমি লিখতে বসে কাগজের উপর শুধুমাত্র কলম বসিয়ে রাখতাম, আর কলম তার আপন গতিতে লিখতে শুরু করত।’

আর আমার তাওয়াজ্জুহ্ নিবন্ধ থাকতো সরকারে দো'আলম নূরে মুজাস্‌সাম রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামার নূরানী চেহারা-এ আনোয়ারের প্রতি। এ কিতাবটিতে রয়েছে কুরআন-হাদীসের নিগূঢ় রহস্যভরা এবং জ্ঞানার্জনের রত্নভান্ডার সর্বোপরি প্রিয় রাসূলের নূরানী জিন্দেগী, গুণাবলী ও মু'জিযাতের অকুল সমুদ্র। যেখানে রয়েছে ইলমুল কালাম, বালাগাত-মানতিক ও ইলমুল বদি এর সংমিশ্রণে আরবী ভাষার প্রাঞ্জল শব্দ ভান্ডার ও দুর্লভ শব্দ গাঁথুনী, আর অসংখ্য হাদিস ও তাফসিরের বর্ণনা সম্বলিত দুষ্প্রাপ্য তথ্যভান্ডার। গবেষকের গবেষণায় দেখা যায় 'অসাধারণ স্কলার পন্ডিত আলেম ব্যক্তিও যদি শত সহস্র বছর গবেষণা ও সাধনা করে তার পক্ষেও এমন একটি দুর্লভ কিতাব রচনা করা ও লেখা সহজে সম্ভব হবে না। আর এটাই আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত ইলমে লাদুন্নি। ফলে অলৌকিকতা ও আধ্যাত্মিকতার মানদন্ডে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এ গ্রন্থের আবেদন শাশ্বত ও চিরন্তন। যা তাঁর অমর কীর্তি ও অপার সৃষ্টি। এ মহান ওলীয়ে কামিলের হাতে যারা বায়আত গ্রহণ করেছেন তাদের অনেকেই আল্লাহর হাবীবের দীদারে ধন্য হয়ে প্রখ্যাত আউলিয়ায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। হযরত খাজা চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির অসংখ্য কারামত বিদ্যমান, তন্মধ্যে সীমান্ত প্রদেশের এক নবাব সাহেবের পেটের কঠিন পীড়ার আরোগ্য লাভ, অনেক মুরিদকে এক নজরে বেলায়তের উচুঁ স্থানে পৌঁছানো ইত্যাদি। কুতুবে আলম গাউসে দাওরাঁ খাজায়ে খাজেগান হযরত আব্দুর রহমান চৌহরভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ১৩৪৩ হিজরী, ১ জিলহজ্ব ও ১৯২৩ ইংরেজিতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ডাকে সাড়া দিয়ে ইহকালীন জীবন থেকে পর্দা করে মাওলা তা'আলার সান্নিধ্যে চলে যান। তিনি ৮০ বছর দুনিয়াবী জিন্দেগী অতিবাহিত করেন। এ মহান সাধককে পাকিস্তানের চৌহর শরীফে দাফন করা হয়। সেখানেই তাঁর মাজার শরীফ রয়েছে। যা সর্বক্ষণ জায়েরীন ও প্রেমিকদের পদচারণায় মুখরিত থাকে। সকল আশেকান ও ভক্তবৃন্দ তাঁর সান্নিধ্যে গিয়ে ফয়ূজাত লাভে ধন্য হচ্ছেন অহরহ।

উপরোক্ত তথ্যসমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে মাজমুয়ায়ে সালাওয়াতির রাসূলের মুকাদ্দামা (ভূমিকা) আরবী, উর্দু ও বাংলা হতে। উর্দু ভাষায় রচিত ভূমিকাটি আল্লামা ইছমতুল্লাহ্ সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি ও কুতুবুল আউলিয়া হাফেজ ক্বারী আল্লামা সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি নিজেই লিখেছেন। যা পরবর্তীতে আরবী, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায়ও অনুবাদ করা হয়েছে। সেখানে আরো অনেক তথ্য ও আকর্ষণীয় বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে আমি সংক্ষিপ্তাকারে কিছু সম্মানিত পাঠকদের খেদমতে নিবেদন করেছি বেশীর ভাগ পাঠক সংক্ষিপ্ত এবং সারগর্ভ আলোচনাকে পছন্দ করেন। আমি ও আনজুমান রিসার্চ সেন্টারের মহাপরিচালক আল্লামা আবদুল মান্নান সাহেব মাজমু'আহ্-এ সালাওয়াতে রসূলের ১ম পারার বঙ্গানুবাদ করার সময় অনেক জায়গায় হতবাক ও আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়েছি। কলম স্তব্ধ হয়ে পড়েছে, সামনের দিকে আগায় না। এমন শব্দ/বাক্য আমাদের সামনে একের পর এক আসছে যা আমরা বড় বড় আরবী লুগাত (অভিধান) দেখেও সঠিক অর্থ খুঁজে বের করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। এমন মারেফাত ও আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ শব্দ ও বাক্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে যার আসল মর্মার্থ আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না অথচ তিনি (মাওলানা আবদুল মান্নান সাহেব) স্বীয় যুগের জামেয়ার স্কলার ছাত্রদের মধ্যে অনন্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন আর শিক্ষকতার জীবনে নেয়াহত যোগ্য ও পারদর্শী শিক্ষক হিসেবে বিশেষ যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। আমি অধম গুনাহ্গার জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার ছাত্রদেরকে কিতাবুল আশবাহ্ ওয়ান্নাযায়ের, শরহে মায়ানিয়ুল আসার, নুখবাতুল ফিক্‌র, মুকাদ্দামায়ে মুসলিম, মুখতাচারুল মায়ানী ও শরহে আকায়িদে নসফীসহ (যেগুলোকে বড় মাপের মুহাক্কিক আলিমরা কঠিন কিতাব হিসেবে গণ্য করে থাকেন) অন্যান্য কিতাবসমূহ পাঠদান করেছি (এটা আমার বাহাদুরী নয়, আল্লাহ্-রসূলের মেহেরবানী এবং মাশায়েখে হযরতের নেগাহে করম।) কিন্তু আমার নিকট উপরোক্ত কিতাবের চেয়েও খাজায়ে খাজেগান খাজা চৌহরভী রহমাতুল্লাহি আলায়হির রচিত মাজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রসূলের অনেক শব্দ ও বাক্য বহুগুণ বেশী কঠিন ও সাহিত্যিকতা ও ভাষাগত দিক দিয়ে অনেক উচ্চাঙ্গের মনে হয়েছে। এটাই বাস্তব সত্য, বাস্তবে এ কিতাব মুহায়্যিরুল উকুল তথা মহা জ্ঞানীদের বিবেক ও আকলকে স্তব্ধ করে দেয়। মূলতঃ এ কিতাব উচ্চাঙ্গের ভাষা শৈলীতে রূপায়িত সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের জীবন চরিত ও দরুদ-সালামের উপর লিখিত ইলমে লাদুন্নীর এ মহা ভান্ডার। তাই বিগত আশির দশকে হুযুর কেবলা গাউসে জমান, আলে রসূল আলম বরদারে আহলে সুন্নাত আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হির খেদমতে এ বরকতমন্ডিত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রসঙ্গে নিবেদন করা হলে

হুযুর কেবলা এরশাদ করেছিলেন, ‘পেহলে উসকা উর্দু মে তরজমা হো জায়ে, ফের উর্দু সে বাংলা মে তরজমা করনা আসান হোগা।’ অর্থাৎ প্রথমে সেটার উর্দু ভাষায় অনুবাদ হয়ে যাক। তারপরে উর্দু হতে বাংলায় অনুবাদ করা সহজ হবে। এটা হুযুর কেবলার বেলায়তী দৃষ্টির উজ্জ্বল প্রমাণ। উর্দু অনুবাদ না হলে এ গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের পক্ষে মোটেই সম্ভবপর হত না। বর্তমানে এ মহা জ্ঞানসমুদ্র তথা মজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রসূলের বিশুদ্ধ উচ্চারণসহ সরল বাংলায় অনুবাদ প্রকাশ করে নেহায়ত কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে আনজুমান ট্রাস্ট’র প্রকাশনা বিভাগ। বস্তুতঃ এটা বাংলা শিক্ষিত লাখো লাখো জ্ঞান পিপাসুদের জ্ঞান জগতকে প্রশস্ত করেছে।

সুতরাং আরাকিনে আনজুমানের প্রতি অসংখ্য মোবারকবাদ এবং এ অনন্য গ্রন্থের উর্দু, বাংলা অনুবাদে যাঁরা শ্রম ও মেধা ব্যয় করেছেন তাদের প্রতি জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। ইলমে লাদুন্নির ধারক ও বাহক খাজা চৌহরভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি শাহানশাহে সিরিকোট, গাউসে জমান আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি, মওজুদা হুজুর কেবলা আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মু.জি.আ.) ও পীর আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবের শাহ্ (মু.জি.আ.)’র খেদমতে আকদাসে জানাই অসংখ্য শুকরিয়া। পরম করুণাময় রাব্বুল আলামীন ও মহা জ্ঞান সমুদ্র হতে আমাদেরকে এবং আমাদের নতুন প্রজন্মকে জ্ঞান আহরণ করে ইহ ও পরকালকে ধন্য করার তাওফিক দান করুন। আমিন

লেখক: অধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

ইসলামি সংস্কৃতির উন্নয়ন ও পূনর্জীবনে গাউসে জামান, আল্লামা

সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)’র অনন্য অবদান

মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার

প্রারম্ভিক

মাতৃগর্ভের অলী, গাউসে জামান, মুজাদ্দিদে দ্বীন, আল্লামা হাফেজ সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি ১৯১৮-২০ খ্রিস্টাব্দে (১৩৩৮-৪০ হিজরি), পাকিস্তানের সাবেক উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিখ্যাত দরবারে আলিয়া কাদেরিয়া সিরিকোট শরিফে জন্ম গ্রহণকারি এক ক্ষণজন্মা আধ্যাত্মিক-সংস্কারক ব্যক্তিত্ব। তাঁর পিতা, কাদেরিয়া ত্বরিকার এ মহান দরবারে সিরিকোটের প্রতিষ্ঠাতা, পেশোওয়ায়ে আহলে সুন্নাত, সৈয়্যদুল আউলিয়া, শাহানশাহে সিরিকোট আল্লামা হাফেজ সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রহমতুল্লাহি আলাইহি (১৮৫৬-১৯৬১ খ্রি), যিনি এশিয়ার অন্যতম সেরা সুন্নি মারকাজ চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসা (১৯৫৪ খ্রি), আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া সহ বহু দ্বীনি প্রতিষ্ঠান-সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ও বার্মার খ্যাতনামা ইসলাম প্রচারক ছিলেন। আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি রাসূলে পাক সলাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ৩৯ তম অধস্তন বংশধর। তাঁর পিতা-মাতা উভয়েই বিখ্যাত 'মাশওয়ানি' বংশধারার ‘সৈয়্যদ’[১]।

ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি’র ৩৭তম উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ। (সাজরা শরিফ, প্রকাশনায় -আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, চট্টগ্রাম)। ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ২২ তম অধস্তন বংশধর, সৈয়্যদ গফুর শাহ্ ওরফে কাপুর শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হিই সর্বপ্রথম শিখদের কবল থেকে এই পার্বত্য অঞ্চল ‘সিরিকোট’ বিজয় করেন, তাই তাঁকে ‘ফাতেহ সিরিকোট’ বা সিরিকোট বিজয়ী বলা হয়।[২] উল্লেখ্য, ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ৫ম অধস্তন পুরুষ সৈয়্যদ জালাল আর রিজাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মদিনা শরিফের আবাস ছেড়ে ইরাকের আউসে চলে আসেন এবং তাঁর আগমনের ফলে আউস ইসলামি শিক্ষা -সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল।[৩]

সৈয়্যদ জালাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ৫ম অধস্তন পুরুষ মীর সৈয়্যদ মুহাম্মদ গীসুদারাজ (ওফাত, ৪২১ হিজরি) আউস হতে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে হিজরত করেন আফগানিস্তান। তাঁরই ১২ তম অধস্তন পুরুষ হলেন সৈয়্যদ গফুর শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি যিনি আফগানের কোহে সোলায়মানি থেকে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এসে সিরিকোট বিজয় করেন। আর এই সিরিকোট বিজয়ী গফুর শাহ্ (র)’র ১৫ তম অধস্তন পুরুষ হলেন প্রবন্ধটির আলোচ্য ব্যক্তিত্ব আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি।[৪] ১৯৬১ খ্রি (১১ জিলক্বদ ১৩৮০) তে, আব্বা হুজুর সিরিকোটি (র)’র ওফাতের পর হতে দরবারে সিরিকোটের সাজ্জাদানশীন এবং আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, বার্মা, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এক বিশাল দ্বীনি দায়িত্ব সফলভাবে সম্পন্ন করে তিনি ১৫ জিলহজ্ব ১৪১৩ হিজরি সোমবার (৭ জুন ১৯৯৩) সিরিকোট দরবার শরিফে ওফাত বরণ করেন। এরপর হতে, তাঁর বড় শাহজাদা, রাহনুমায়ে শরিয়ত ও ত্বরিকত, আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.জি.আ) এবং ছোট শাহজাদা, পীরে বাঙাল, আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবের শাহ্ (মা.জি.আ) বর্তমানে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে দরবার ও আনজুমান ট্রাস্ট পরিচালনা করছেন। বর্তমানে আল্লামা তাহের শাহ্’র (১৯৮৭-২০১৭ পর্যন্ত) নেতৃত্বে চট্টগ্রামের জসনে জুলুসে ৩০-৪০ লাখ মানুষের অংশগ্রহণ হচ্ছে বলে ধারনা করা হয় এবং বর্তমানে তাঁর হাতে লক্ষ লক্ষ দিশেহারা মানুষ আলোর পথ পেয়েছেন, এমনকি বাংলাদেশব্যাপি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শতাধিক দ্বীনি প্রতিষ্ঠান।

---

[১]. হা'লাতে মাশওয়ানি, মুহাম্মদী স্টীম প্রেস,পাকিস্তান

[২]. ষড়পধষ মড়াঃ ধপঃ, জবভ-১৫, ঐধুধৎধ ১৮৭১,চধশরংঃধহ

[৩] . কাজী আবদুল ওহাব, মাসিক তরজুমান, জিলহজ্ব ১৪৩৩ হিজরি

[৪]. সাজরা শরিফ, প্রাগুক্ত।

সংস্কৃতির আওতা

ইংরেজি Culture শব্দের পরিভাষা হিসেবে বাংলা ‘সংস্কৃতি’ শব্দটি পরিচিত। এর আভিধানিক অর্থ শিক্ষা বা অভ্যাস দ্বারা লব্ধ উৎকর্ষ বা কৃষ্টি। সম্ -কৃ (করা) +ক্তি-এ ব্যুৎপত্তির মধ্যেই নিহিত থাকে পরিশীলিত, পরিমার্জিত, পরিশ্রুত, নির্মলীকৃত, শোধিত এ ধরনের অনুভবসমূহ। ফলে উৎকর্ষময় বা পরিশ্রুত জীবন চেতনাই সংস্কৃতির সারাৎসার-এ উক্তি মূলানুগ।[৫] ড: আহমদ শরীফের মতে, সংস্কৃতি হল মানুষের অর্জিত আচরণ, পরিশ্রুত জীবন চেতনা’। তাঁর মতে, সংস্কৃতির উদ্ভব হয় প্রজ্ঞা ও বোধিসম্পন্ন ব্যক্তি চিত্তে এবং বিকাশ হয় ব্যক্তি থেকে ক্রমে সমাজে এবং সমাজ থেকে তা বিশ্বে ব্যপ্ত হয়। তাঁর মতে, চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে জীবনের সুন্দর, শোভন, পরিশীলিত ও পরিমার্জিত অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি।[৬]

তাজুল ইসলাম হাশেমীর মতে মানুষের চিন্তাধারা, মূল্যবোধ, আচার-বিশ্বাস, শিল্পকলা, আইন-কানুন, অনুশীলন ও অভ্যাস এবং তাঁর সমগ্র সৃষ্টির সমষ্টিই তার সংস্কৃতি।[৭]

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর ‘সংস্কৃতি কথা’ মতে, সংস্কৃতির অনিবার্য শর্ত হচ্ছে মূল্যবোধ।[৮]

উপরোক্ত, বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনায় আমরা বলতে পারি সংস্কৃতি হল মূলত সুন্দর, পরিশুদ্ধ জীবনাচার বা জীবন ব্যবস্থার নাম। আর ইসলাম হল একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এমনকি আল্লাহর নিকট মনোনীত একমাত্র জীবনধারা হল ইসলাম “ইন্নাদ্ দী-না এনদাল লাহিল ইসলাম”।[৯]

উক্ত আয়াতের মর্মার্থ হল ইসলামি জীবনধারা বা জীবনাচারই মূলত গ্রহণযোগ্য এবং বিশুদ্ধতম। আর যেহেতু ব্যক্তি থেকে সমাজে এবং বিশ্বে ক্রমে সংস্কৃতি ছড়িয়ে যায়, সুতরাং ইসলামি সংস্কৃতির বিকাশেও উক্ত বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন দেখা যাবে। প্রকৃত অর্থে ইসলামের শিক্ষা-সংস্কৃতির শুরুটা হয় আদি মানব এবং নবী হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম হতে। আর এর পরিপূর্ণতা আসে শেষ এবং শ্রেষ্ঠ নবী মুহম্মদুর রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে।’ ‘আল ইয়াওমা আক্বমালতু লাকুম দ্বীনাকুম ওয়াত মামতু আ'লাইকুম নে’মাতি।[১০]

খোলাফায়ে রাশেদীন সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বাইত, আউলিয়ায়ে কেরাম, ইসলামের প্রভাবশালী দার্শনিক-বুদ্ধিজীবী, ওলামা-পীর-মাশায়েখ এমনকি গ্রহণযোগ্য ইসলামি নেতৃত্ব-ব্যক্তিত্বের অবদানের কারণে আজ চৌদ্দশ বছর ধরে এর পরিধি সম্প্রসারিত হচ্ছে। আকার বাড়ছে এর উপরি কাঠামোর (super structure)। যেমন, আমাদের সৃষ্টি পর্বের শুরুতে, হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে সৃষ্টির বিরোধিতা হয়েছিল, দোষারোপ হয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে, আর কোন প্রকারের অপরাধ না করেও বাবা আদম আলায়হিস্ সালাম আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা চেয়ে আমাদেরকে যে বিনয়ের কালচার শিক্ষা দিয়েছেন তাই প্রকৃত অর্থে সংস্কৃতি, বা ইসলামি সংস্কৃতি। তাঁর সে বিনয়ী ফরিয়াদ ছিল, ‘রাব্বানা যোয়ালামনা আনফুসিনা ওয়াইনলাম তাগফিরলানা ওয়াতার হামনা লানা কু নান্না মিনাল খাসেরীন।’ অর্থাৎ হে প্রভু! আমি অপরাধী (নিজের উপর জুলুম করেছি), যদি তুমি আমায় মাফ না কর, যদি তুমি দয়া না কর, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে গণ্য হব।’[১১]

আলহামদুলিল্লাহ্, প্রকৃত অলী-আউলিয়া, সূফি-দরবেশদের হাতে এমন সংস্কৃতির বিকাশ এখনো চলছে, কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। যেমন, গাউসে জামান তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলতেন যার মধ্যে আমিত্ব-অহংকার আছে, তার কাছে ত্বরিকতের গন্ধও নাই। তিনি বলতেন, ‘মেই কা পট্টি ছোড়’। বলতেন আপনাকো হাকির সমঝো, না’চিজ সমঝো’ জররা এ না চিজ সমঝো’, অর্থাৎ নিজেকে পায়খানার চেয়েও নিকৃষ্ট মনে কর ইত্যাদি। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, অপসংস্কৃতির শুরু ইবলিশের হাতে, এবং হাজার হাজার বছর ধরে এর বিকাশ চলছে মানবজাতির এই প্রধান শত্রু ইবলিশ শয়তানের অনুসারিদের মাধ্যমে। তাই আশরাফুল মাখলুকাত বা পরিশীলিত মানুষরাই সংস্কৃতির বাহক। আর, ইবলিশ ও তার অনুগত মানুষরূপী ইবলিশদের হাতেই অপসংস্কৃতি ছড়ায়। সেদিন ইবলিশ, হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে সেজদা না করে

---

[৫] নরেন বিশ্বাস, ইতিহাসের আলোকে বাংলাদেশের সংস্কৃতি, সুকান্ত একাডেমী, ঢাকা,পৃ-৯

[৬] মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক সন্ত্রাস, পৃ-৮, প্রকাশক- ফজলুল করিম তালুকদার, চট্টগ্রাম ২৭ মার্চ ২০০2।

[৭] প্রাগুক্ত, পৃ -৮

[৮] প্রাগুক্ত, পৃ-৯

[৯] আল কুরআন

[১০] আল আয়াত

[১১] আল কুরআন

আল্লাহর আদেশের অমান্য করেছিল এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়, ওয়া কা'না মিনাল কাফেরীন ।[১২]

ইবলিশ অহংকার করে বলেছিল যে সে আদম আলায়হিস্ সালাম'র চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাকে আগুন হতে আর আদম আলায়হিস্ সালামকে মাটি হতে বানানো হয়েছে ।' আর, এ অহংকারের কালচারই বর্তমানে শয়তানি প্ররোচনায় ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বব্যাপি । শয়তানের সমালোচনার তীর আদম আলায়হিস্ সালাম'র দিকে তাক করেছিল, অথচ হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম করেন আত্মসমালোচনা । এটিই পছন্দ হল আল্লাহর কাছে । আমাদের প্রথম মানব তাঁর বংশধরদের আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা হবার আচরণ শিক্ষা দিয়েছিলেন, আর সূফি-দরবেশ, আউলিয়ায়ে কেরামগণ তাঁদের অনুগতদের সেই শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন । গাউসে জামান তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলতেন, 'তুমি অন্যের সমালোচনা, বা বদনামের জন্য আঙুল তাক কর একটি, আর তোমারই বাকি চার আঙুল তোমার দিকে তাক হয়ে, তোমাকে জানিয়ে দেয় যে, তুমিত তারচেয়ে চারগুণ বেশি খারাপ!' বদরুদ্দিন ওমর'র মতে, 'জীবন চর্চারই অন্য নাম সংস্কৃতি । মানুষের জীবিকা, তার আহার-বিহার, চলাফেরা, তার শোকতাপ, আনন্দ-বেদনার অভিব্যক্তি, তার শিক্ষা-সাহিত্য, ভাষা, তার দিন রাত্রির হাজারো কাজ কর্ম, সবকিছুর মধ্যেই তার সংস্কৃতির পরিচয় ।[১৩]

জীবন-জীবিকার বিষয়টি সংস্কৃতির আলোচনায় অবিচ্ছেদ্য একটি দিক । আর, এই জীবন-জীবিকা উপভোগের এক অসুস্থ প্রতিযোগিতার পরিণামেই এই মানুষ হয়ে ওঠে অমানুষ, অহংকারী শয়তান । তাই, জীবন- জীবিকা অর্জনে সীমালঙ্গন থামাতে হুজুর কেবলা তৈয়্যব শাহ্'র শিক্ষা ছিল অত্যন্ত চমৎকার । তিনি বলতেন, নৌকা চলতে পানির দরকার হয় বটে, কিন্তু সেই পানি যেন নৌকার পৃষ্ঠে রাখা হয়, পানিকে বুকে যেন প্রবেশের সুযোগ না দেওয়া হয় । কারণ, নৌকার বুকে পানি ওঠার পরিণাম হল নৌকা ডুবি, ভয়ানক বিপদ, তেমনি,যতক্ষণ এই দুনিয়াতে আছি, ততক্ষণ এ কে ছাড়া চলবেনা বটে, কিন্তু, একে বুকে নিতে গেলেই মানুষের ধ্বংস নেমে আসে, তাই দুনিয়াকেও বুক নয়, পৃষ্ঠ প্রদর্শণ করতে হবে, সুবহানালাহ, কী দার্শনিকতা তাঁর তালিম-তারবিয়াতে । এ হল, প্রকৃত ইসলামি সংস্কৃতির মূল্যবোধ শিক্ষার একটি দিক সম্পর্কে ধারণা মাত্র । এরুপ, রয়েছে বহু উদাহরণ । যেহেতু সংস্কৃতির আওতাভুক্ত অপরাপর বিষয়গুলোও এ প্রবন্ধের আলোচনায় আনা উচিত, তাই আমরা সে সব বিষয়ে সংক্ষেপ পরিচয় দেওয়ার প্রয়াস পাব । ইতোপূর্বের আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে, আমাদের শিক্ষা, শিল্প-সাহিত্য, আইন -আদালত, আচার-বিশ্বাস, চলাফেরা, দিন রাত্রির হাজারো কাজ কর্ম কোন কিছুই বাদ থাকেনা এ আলোচনায়, তাই এটি একটি ব্যাপক বিষয় । আমরা মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে, নিবন্ধের শিরোনামের প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় আলোচনা করব ।

শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার

সংস্কৃতির আভিধানিক অর্থ হল, শিক্ষা বা অভ্যাস দ্বারা অর্জিত উৎকর্ষ বা কৃষ্টি । আর, পরিশীলিত, পরিশ্রুত জীবনাচার শিক্ষার প্রধান বাহন হল ধর্মীয় শিক্ষা, যার মূল ঠিকানা হল মাদরাসা । বিশেষত যে সব মাদরাসা কোরান-সুন্নাহ্-ফেকাহ্ শিক্ষার পাশাপশি সূফি-আউলিয়ায়ে কেরামের চিন্তাধারা বা জীবনাচারের তালিম -তারবিয়াতি ব্যবস্থা রয়েছে সে সবেই রয়েছে প্রকৃত ইসলামের আক্বিদা ও আমল । গাউসে জামান তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি এক্ষেত্রে ছিলেন তাঁর পিতা শাহানশাহে সিরিকোট, আল্লামা হাফেজ সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র পদাংক অনুসারি । সিরিকোটি হুজুর চট্টগ্রামে এমন আদর্শ স্থানীয় মাদরাসার এক অনন্য নমুনা জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং মুরীদ-ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন -'মুঝেহ্ দেখনা হ্যায় তো মাদরাসা কো দেখো, মুঝসে মহব্বত হ্যায় তো মাদরাসা কো মহব্বত করো' । ঠিক তেমনি আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছিলেন, ''কাম করো, দ্বীনকো বাচাও, ইসলাম কো বাচাও, সাচ্চা আলেম তৈয়ার করো'', এবং প্রতিষ্ঠা করেছেন ঢাকা-মুহম্মদপুরস্থ কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া (কামিল) মাদরাসা, হালিশহর তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া (ফাজিল) মাদরাসা, চন্দ্রঘোনায় তৈয়্যবিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া (ফাজিল) মাদরাসা সহ বহু দ্বীনি প্রতিষ্ঠান । পরবর্তিতে, তাঁর প্রেরণায় উজ্জীবিত মুরীদ-ভক্তদের হাতে নির্মিত হয়েছে শতাধিক মাদরাসা, যে সব মাদরাসায় শিক্ষা দেওয়া হয় ইসলামের মূলধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত 'র আক্বিদা-আমল তথা প্রকৃত ইসলামের সংস্কৃতি । ফলে, আজ এ সব

---

[১২] .আয়াত

[১৩] . প্রাগুক্ত, পৃ -৯

মাদরাসার শত শত 'সাচ্চা আলেম' দেশ -বিদেশে সুন্নিয়ত ভিত্তিক সূফিবাদী ইসলামি কালচারের পরিধিকে দিন দিন সম্প্রসারিত করে চলেছে।

খানেক্বাহ্ ভিত্তিক সংস্কৃতির জাগরণে

এ উপমহাদেশের ইসলামি সংস্কৃতির হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি প্রতিষ্ঠান হল খানেক্বাহ্। গাউসে জামান তৈয়্যব শাহ্'র সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পথ ধরে বর্তমান পর্যন্ত শত শত খানেক্বাহ্ প্রতিষ্ঠিত হয়ে শহর-গ্রাম -বন্দরে ত্বরিকত ভিত্তিক সাংস্কৃতিক চর্চা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাঁর জীবদ্দশায়, তিনি তদীয় আব্বা হুজুর কেবলার স্মৃতিময় চট্টগ্রাম আন্দরকিল্লাস্থ আলহাজ আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ারের 'কোহিনুর মনজিল', এরপর পার্শবর্তী আলহাজ আবদুল জলিল সওদাগরের 'বাংলাদেশ প্রেস'কে খানেক্বাহ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া, ঢাকার কায়েৎটুলিস্থ খানেক্বাহ্ শরিফ সহ আরো বেশ কিছু পুরোনো প্রতিষ্ঠান তাঁর হাতে চাঙ্গা থাকে। এরপর আনুমানিক ১৯৬৫ সনের দিকে, আলহাজ নুর মুহম্মদ আল কাদেরীর হাতে প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রামের কোরবানিগঞ্জস্থ বলুয়ারদীঘি পাড়ের ঐতিহ্যবাহী খানেক্বাহ্ শরিফ ছিল জীবদ্দশায় হুজুর কেবলা তৈয়্যব শাহ্'র প্রধান নিদর্শন। তিনি এখানে তাঁর শেষ সফর ১৯৮৬ পর্যন্ত রাত যাপন থেকে শুরু করে সকল ত্বরিকতের কাজ এবং আনজুমানের কাজ সহ যাবতীয় কর্মকান্ড চালাতেন। প্রতিদিন ফজরের নামাজের পর তিনি এখানে কোরানে করিমের দরস দিতেন। বাংলাদেশ ও বিশ্ব ইসলামি সংস্কৃতিতে তাঁর অনন্য উপহার 'জসনে জুলুস'র প্রথম যাত্রাটি হয়েছিল এই বলুয়ারদীঘি পাড় খানক্বাহ্ হতে, ১৯৭৪ সনে (১২ রবিউল আউয়াল, ১৩৯৫ হিজরি) তারিখে, তাঁরই নির্দেশে আলহাজ্ব নুর মুহম্মদ আল কাদেরীর নেতৃত্বে। আজ এই খানেক্বাহ্ শরিফ এবং তাঁর নির্দেশে পরবর্তিতে প্রতিষ্ঠিত ষোলশহর জামেয়া সংলগ্ন আলমগীর খানেক্বাহ্ শরিফ সহ বহু খানেক্বাহ্ শরিফে প্রতিদিন চলছে কাদেরিয়া ত্বরিকার খতমে গাউসিয়া শরিফ, মীলাদ, সালাত-সালাম, এবং প্রতি মাসে পালিত হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী গেয়ারভী শরিফ সহ বিভিন্ন ইসলামি কর্মকান্ড। বিশেষত, আলমগীর খানেক্বাহ শরিফ বর্তমানে শরিয়ত-ত্বরিকতের যাবতীয় শিক্ষা -সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে শরিয়তের মাসয়ালা -মাসায়েল শিক্ষা প্রকল্প 'দাওয়াতে খায়র' এর প্রধান কেন্দ্র হিসেবেও এ খানেক্বাহ্ ব্যবহৃত হচ্ছে। এখন হুজুরের শত শত খানেক্বাহ্ শরিয়ত-ত্বরিকতেরর নির্মল সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র হিসেবে আলো ছড়াচ্ছে সমগ্র দেশে, এমনকি বিদেশেও।

জসনে জুলুস প্রবর্তক

বর্তমান বিশ্ব ইসলামি সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণীয় এবং জনপ্রিয় সংযোজন হল জসনে জুলুস। সাধারণত এর অর্থ বর্ণাঢ্য শোভা যাত্রা বা মিছিল বোঝানো হলেও, বর্তমানে এটি অধিকতর প্রাসঙ্গিকতা পেয়েছে 'জসনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' হিসেবে। এটি এখন মিলাদুন্নবী শোভাযাত্রা বোঝায় বিশ্বব্যাপি। পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদযাপন বর্তমানে এক বর্নাঢ্য রুপ পেয়েছে এ জসনে জুলুসের সৌন্দর্য ও প্রভাবে। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, আজ হতে চৌদ্দশ বছর আগে সমগ্র সৃষ্টির রহমত নবী মুহম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা শরিফ থেকে হিজরত করে মদিনায় পৌঁছেন সেদিন এই শ্রেষ্ঠ অতিথির আগমন সংবাদে মদিনার উপকন্ঠে এসে জড়ো হয়েছিলেন মদিনার সকল বয়সী নারী-পুরুষেরা। তাঁরা তাঁদের প্রিয়তম এ অতিথি নবীজিকে নিয়ে কাসিদা গাইতে গাইতে বর্নাঢ্য শোভাযাত্রা বা জসনে জুলুস সহকারে শহরের অভ্যন্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার এ ধরাপৃষ্ঠে নবীজির শুভাগমন অর্থাৎ মীলাদের সময়ে মা আমেনার ঘরে এসেছিল অসংখ্য ফেরেস্তা ও জান্নাতি রমনীদের নূরানি মিছিল। ৮ম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং নবী পাক ও লক্ষাধিক সাহাবায়ে কেরামের মিছিল। ধর্মীয় শোভাযাত্রার এ সব ঐতিহ্যকে ধারন করেই প্রবর্তিত হলো নবীজির শুভ আগমন বা মীলাদ উপলক্ষে জসনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবী। বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বিশাল এবং আকর্ষণীয় যে জসনে জুলুসটি সমগ্র বিশ্ববাসীর দৃষ্ট আকর্ষণ করেছে সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসা হতে প্রতিবছর ১২ রবিউল আউয়াল যে জসনে জুলুসটি বের হয়ে আসছে। আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত চট্টগ্রামের এ জসনে জুলুসে লোক সমাগম হয় অন্তত চল্লিশ লক্ষ। এ উপলক্ষে ১২ রবিউল আউয়াল সমগ্র চট্টগ্রাম শহরে ওঠে সাজ সাজ রব। চট্টগ্রামের এ জসনে জুলুস শুরু হয় ১৯৭৪ সনে, রাসুলে পাকের ৩৯ তম অধ:স্তন বংশধর, মাতৃগর্ভের অলী,দরবারে আলিয়া কাদেরিয়া সিরিকোট শরিফের তৎকালিন সাজ্জাদানশীন, আল্লামা হাফেজ সৈয়্যদ মুহম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র নির্দেশ ও রূপরেখা

অনুসরণে। সেদিন ১৯৭৪ এর ১২ রবিউল আউয়াল সকালে আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ নূর মুহম্মদ আল কাদেরীর নেতৃত্বে কোরবানিগঞ্জস্থ বলুয়ারদিঘীপাড় খানকাহ্ এ কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া হতে শুরু হয়ে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সমূহ প্রদক্ষিণ করে ষোলশহর জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসা ময়দানে এসে ওয়াজ, মিলাদ ও মুনাজাতের মাধ্যমে শেষ হয়েছিল জুলুসটি।

১৯৭৬-১৯৮৬ পর্যন্ত এর নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং এর প্রতিষ্ঠাতা রূপকার গাউসে জামান তৈয়্যব শাহ রহমাতুল্লাহি আলায়হি। ১৯৮৭ হতে ৩৩ বার এর নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁরই শাহজাদা এবং সাজ্জাদানশীন, রাহনুমায়ে শরিয়ত ও তরিকত, আল্লামা সৈয়্যদ মুহম্মদ তাহের শাহ্ (মাজিআ)। ১৯৭৪ সনে শুরু হওয়া এ জসনে জুলুস বর্তমানে চল্লিশ লাখ মানুষের জনস্রোতে রুপ নিয়েছে এই মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব আল্লামা তাহের শাহ 'র নেতৃত্বে। ধারনা করা যায়, এই জসনে জুলুসটিই বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ এবং এটিই বিশ্বের অপরাপর জুলুসের মূল প্রেরণা। সে হিসেবে এর প্রতিষ্ঠাতা রুপকার, ইসলামের মহান সংস্কারক, আল্লামা সৈয়্যদ মুহম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি হলেন বিশ্ব জসনে জুলুসের প্রকৃত স্বপ্নদ্রষ্টা এবং রুপকার। বিচ্ছিন্নভাবে অনাড়ম্বরভাবে পৃথিবীর অন্য কোথাও জসনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবী আয়োজন এর আগে হলেও হতে পারে। হয়তো সেগুলোর খবর বিশ্ববাসীর কাছে সময়মত এসে পৌঁছায়নি, বা ঐ সব আয়োজন মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। সে হিসেবে শুরুতেই প্রথমে সমগ্র বাংলাদেশে এবং পরবর্তিতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের প্রেরনার কারণ হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছে চট্টগ্রামের এই বিশাল আয়োজনটি। তাই বলা যায়, এটিই বিশ্ব জসনে জুলুসের প্রেরণাদানকারী প্রথম জুলুস এবং এর রুপকার আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ হলেন এর প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ। যেভাবে বলা যায় যে, ভারত বর্ষে ইসলামের সূচনা ৭১২ খ্রিস্টাব্দে আরবদের সিন্ধু বিজয় বা আরো আগের পীর দরবেশদের মাধ্যমে শুরু হলেও তাঁদের হিন্দুস্তানে ইসলামের সূচনাকারী বলা যায়, আর প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় খাজা গরীব নওয়াজ মঈনুদ্দিন চিশতি রহমাতুল্লাহি আলায়হিকে যিনি এসেছিলেন আরো পাঁচশত বছর পরে। কারণ, তাঁর হাতে ইসলামের জোয়ার এসেছিল এ উপমহাদেশে।

সাহিত্য প্রকাশনা

শিল্প -সাহিত্য- ভাষা, সংস্কৃতির বড় বাহন, যা শুরুতে বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও হুজুর তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র অবদান অসামান্য। সুন্নি মতাদর্শ ভিত্তিক দ্বীনি শিক্ষা -সংস্কৃতিকে ভিন্ন ভাষা থেকে বাংলায় ভাষান্তর করে বাঙালি মুসলিম সমাজকে উপকৃত করবার প্রয়োজন অনুভব করে তিনি ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৬ তারিখে,আনজুমান এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার এক সভায় 'তরজুমান এ আহলে সুন্নাত' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশের নির্দেশ দেন। ১৯৭৭ সনের জানুয়ারি থেকেই এর প্রকাশ শুরু হয়ে অদ্যাবধি চালু আছে। বিগত চার দশক ধরে এ 'তরজুমান' সুন্নি অঙ্গনের প্রধান মাসিক পত্রিকা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, খাজা চৌহরভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি রচিত, ৩০ পারা দরুদ গ্রন্থ 'মজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' যা ১৯৩৩ সনে রেঙ্গুন হতে সিরিকোটি হুজুরের হাতে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, তা পরবর্তিতে তৈয়্যব শাহ্ হুজুরের তত্বাবধানে হুবহু প্রকাশ ছাড়াও উর্দু তরজমা সহ প্রকাশ করা হয়। ইলমে লাদুন্নির এক বিরল আধার এই উচ্চাঙ্গের আরবী ভাষার দরুদ গ্রন্থটি তাঁর তত্বাবধানে উর্দুতে প্রকাশ হবার সুবাদে বর্তমানে বাংলা ভাষায় তরজমা হয়ে এ মহাগ্রন্থের বরকত ও জ্ঞান বাঙালিদের কাছে ছড়িয়ে পড়বার সুযোগ তৈরী হল। বর্তমানে এর অর্ধেক কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছেন হুজুরের বিশিষ্ট মুরীদ আনজুমান রিসার্চ সেন্টারের মহাপরিচালক আল্লামা মুহম্মদ আবদুল মান্নান ও সৈয়্যদ মুহম্মদ জালাল উদ্দিন আল আজহারী। খাজা চৌহরভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র দৈনন্দিন অজিফা যা ত্বরিকত পন্থীদের আধ্যাত্মিক উন্নয়নের পথে বড় সহায়ক নেয়ামত, তা সংকলন করে 'আওরাদুল কাদেরিয়াতুর রহমানিয়া' নামে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন হুজুর তৈয়্যব শাহ্। শুধু তাই নয়, তাঁর দিক -নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামি সাহিত্য প্রকাশনার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পাওয়ায় বর্তমানে প্রায় অর্ধশত কিতাব আনজুমান হতে প্রকাশিত হয়ে বাঙালি মুসলমানদের সেবা দিয়ে যাচ্ছে-যেখানে 'গাউসিয়া তারবিয়াতি নেসাব'র মত অতীব মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয় গ্রন্থও রয়েছে।

সংস্কৃতি চর্চায় মসলকে আ'লা হযরতের সমন্বয়

চতুর্দশ শতাব্দির মহান মুজাদ্দিদ, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র সাথে বাংলা ভাষাভাষিদের প্রথম পরিচয়ের বুনিয়াদি প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রামের জামেয়া প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শাহানশাহে সিরিকোট যে বীজ বপন করেছিলেন, একে বর্তমানের বটবৃক্ষ বানিয়েছেন আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ হুজুর। আ'লা হযরত ইসলামের বিশুদ্ধ শিক্ষা -সংস্কৃতি-আক্বিদা-আমলের যে ধারার মাধ্যমে বিগত শতাব্দিতে দ্বীনের সংস্কারক (মুজাদ্দিদ) হিসেবে গণ্য হয়েছেন, সে সংস্কার কর্মসূচি আল্লামা তৈয়্যব শাহ্'র হাতে বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পৌঁছে যায়। আ'লা হযরত রচিত সালামে রেযা 'মুস্তফা জানে রহমত পে লাখো সালাম, না'তিয়া কালাম' 'সবসে আওলা ওয়া আ'লা হামারা নবী'র মত অত্যন্ত জনপ্রিয় ইসলামি সংস্কৃতি বাংলাদেশ, বার্মা সহ পৃথিবীর বহুদেশে গৃহীত হয় আল্লামা তৈয়্যব শাহ্'র কারণে। তিনি মাদরাসার এসেম্বলিতে যে 'সবসে আওলা' 'নাত' চালু করেছেন, তা আজ আনজুমান পরিচালিত শত মাদরাসা ছাড়াও দেশের প্রায় সুন্নি মাদরাসায় গৃহীত হয়েছে। খতমে গাউসিয়া, গেয়ারভী শরিফ সহ মীলাদ-কেয়াম, ওয়াজ মাহফিল সর্বত্র এখন যে 'মুস্তফা জানে রহমত' সালামি এবং সবসে আওলা না'ত শরিফ চালু হয়েছে, এর সূচনাকারী হলেন তৈয়্যব শাহ্ হুজুর। এ দুটি নাত, সালাম সহ বহু না'ত-কাসিদা আজ আমাদের ইসলামি সংস্কৃতির ভান্ডারকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি এতে এনেছে বৈচিত্র্য। আ'লা হযরত রচিত বিশুদ্ধতম তরজুমানুল কুরআন 'কানযুল ঈমান' এবং এর আলোকে রচিত তাফসির 'নুরুল ইরফান' উর্দু থেকে বাংলাতে তরজমা মূলত তাঁরই পরামর্শ এবং দোয়ার ফসল যা আল্লামা আবদুল মান্নানের মাধ্যমে তিনি করিয়ে নিয়েছেন। আ'লা হযরতের রচনাবলীর বাংলা সংস্করণ এখন অহরহ হচ্ছে এ ঘরানার আলেমদের হাতে, চলছে তাঁর চিন্তাধারার উপর উচ্চতর গবেষণা। হুজুর কেবলা তৈয়্যব শাহ্ 'র মুরীদ এবং চট্টগ্রাম জামেয়ার ছাত্র সৈয়দ মুহম্মদ জালাল উদ্দিন আল আজহারীই প্রথম বাঙালি, যে কিনা আ'লা হযরতের আক্বায়িদী খেদমতের বিষয়ে মিশরের কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে এম ফিল সম্পন্ন করেন। আরবীতে লিখিত এ মূল্যবান থিসিসটিও বাংলাতে আসার দাবি রাখে। আজ, এদেশে আ'লা হযরত চর্চার জন্য যত সংগঠন-সংস্থা-প্রতিষ্ঠান আত্মপ্রকাশ করেছে, সবগুলোর কান্ডারীর ভূমিকায় হুজুর কেবলাদের অনুসারী, বা তাঁদের মাদরাসার ছাত্ররা রয়েছে,এ কথা আজ চোখ বন্ধ করে বলা যায়।

বিচার সংস্কৃতির উন্নয়ন প্রয়াস

আমাদের ছিল বিচার -আদালতের এক উজ্জ্বল ঐতিহ্য, যা ব্রিটিশরা এসে ধ্বংস করে দেয়। ব্রিটিশরা আমাদের ইসলামি আদালতের জায়গায় তাদের ব্রিটিশ পদ্ধতির এমন এক বিচার ব্যবস্থা দিয়ে গেল, যার জালে একবার আটকা পড়লে বাদি-বিবাদি, আসামি-ফরিয়াদি কারোই রেহায় থাকেনা। ত্রিশ বছরেও সমাধা হয়নি এমন মামলাও পাওয়া যাবে। এতদিনে মামলার উভয় পক্ষ শুধু সর্বশান্ত হয়না, তাদের মধ্যে যুগ যুগ ধরে শত্রুতাও চলতে থাকে, এমনকি মামলার মিমাংসার আগেই মারা যায় অনেকে। তাই, আজ, বাংলাদেশেও শালিশী মিমাংসার উপর গুরুত্ব দিয়ে বড় বড় বিজ্ঞাপন দিতে হচ্ছে। আর, এ বাস্তবতা উপলব্ধি করে ১৯১২ সালে, 'তদবিরে ফালাহ্ ওয়া নাজাত ওয়া ইসলাহ্' নামক দিক-নির্দেশনামূলক গ্রন্থে আ'লা হযরত পরামর্শ দিয়েছিলেন, যেন মুসলমানরা ব্রিটিশ আদালত বর্জন করে, এবং নিজেদের মামলা নিজেদের মধ্যে শালিশী ব্যবস্থায় মিমাংসার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। কী আশ্চর্য মিল! দরবারে আলিয়া কাদেরিয়া সিরিকোট শরিফের হযরাতে কেরাম আগে থেকেই এ নীতিতে অটল এবং অনুশীলনকারী ছিলেন। সিরিকোটি হুজুর রহমাতুল্লাহি আলায়হি, তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি এবং বর্তমান সাজ্জাদানশীন আল্লামা তাহের শাহ্, পীর সাবির শাহ্ (মাজিআ) সবাই সিরিকোট অঞ্চলের বিচারক, আর দরবার হল আদালত প্রাঙ্গন। সিরিকোটবাসীর যাবতীয় মামলা-মোকাদ্দমা দরবার শরিফেই নিস্পত্তি হয়ে আসছে আজ পর্যন্ত। যে মামলার বিচার করতে কোর্ট ব্যর্থ, এমন জটিল বিষয়ও মিমাংসা হয়ে যায় দরবারে। তাই, এখানকার মানুষ ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থার ক্ষতির শিকার হয়না।[১৪]

উল্লেখ্য, শুধু স্বদেশে নয়, এ দেশেও হুজুর কেবলা তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি এ বিচার সংস্কৃতি প্রবর্তনে যে প্রয়াস পান তা স্পষ্ট, তবে তা ছিল এ দরবারের ভাই-বোনদের নিজস্ব পরিমন্ডলে, নিজেদের মোয়ামেলাতের বিষয়ে। 'হুজুর আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি, ১৯৭৮ সনে বাগদাদ শরিফ জেয়ারাতে সফরকালীন সময়ে, সেখান থেকেই (বাগদাদ শরিফ থেকেই) এ ব্যাপারে একটি

---

[১৪]. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, আ'লা হযরতের চিন্তাধারা ও শাহানশাহে সিরিকোট, পৃ-১৯, সেমিনার প্রবন্ধ,তারিখ -২১ এপ্রিল ২০০৩, প্রকাশনায়-গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ,কেন্দ্রিয় পরিষদ, ২৪ মার্চ ২০০৫

পরিষ্কার নির্দেশ দিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন আনজুমানকে, এ চিঠিতে তিনি শালিসী বোর্ডের একটি দীর্ঘ তালিকা দেন, এবং বলেন, বিরোধের পক্ষদ্বয় উক্ত তালিকা থেকে নিজেদের পছন্দ অনুসারে দু'জন করে নমিনী দেবেন।উভয়ের পছন্দের চারজন নমিনী একই তালিকা হতে একজন সভাপতি বাছাই করবেন। আর, এ পাঁচ জন শালিশকারী যে সিদ্ধান্ত দেবেন, তা উভয় পক্ষ মানতে বাধ্য থাকবেন। কোন অবস্থাতেই, কোর্ট-কাচারি যাবেন না।[১৫]

হুজুর কেবলার এ দিক-নির্দেশনা এখন আরো বেশি প্রাসঙ্গিক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। আমাদের উচিত, নিজেদের বিচারের ভার কোর্ট-কাচারির পরিবর্তে নিজেদের ভাই-বন্ধু -প্রতিবেশিদের মাধ্যমে উক্ত উপায়ে সমাধা করা। এতে, উভয় পক্ষের আর্থিক ক্ষতি যেমন নাই, তেমনি বিবাদ-বিসম্বাদও সমাধান হয়ে শান্তি ফিরে আসে, যা ব্রিটিশ পদ্ধতির কোর্ট এ পর্যন্ত দিতে সক্ষম হয়নি, ভবিষ্যতেও পারবেনা। বরং মিথ্যা মামলার সংখ্যাই বর্তমানে এসব আদালতে বেশি দায়ের হবার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষত, পারিবারিক আদালতে নারী শিশু আইন-আদালত বরং পরিবারের অশান্তির বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ থেকে ফিরে এসে, আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ প্রদর্শিত বিচার সংস্কৃতির সুযোগ নেওয়া জরুরি বলে মনে করি।

আক্বদ সংস্কৃতির উন্নয়ন

আক্বদ -নেকাহ্ ঐতিহ্যবাহি ইসলামি সংস্কৃতি বরং সুন্নত। আইনের দৃষ্টিতে মুসলিম বিয়ে শুধু একটি ধর্মীয় ফাংশন নয়, বরং একটি সুস্পষ্ট সামাজিক চুক্তি (Social contact)। চুক্তি কখনো অস্পষ্ট হতে পারেনা, একে স্পষ্ট করাই ইসলাম, এবং আইনের বিধান। অথচ, আমাদের বিয়ের আক্বদ সমূহের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই স্পষ্টতাকে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়না বলে মনে হয়। আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি ছিলেন এক্ষেত্রে খুব কঠোর একজন বিচারকের ভুমিকায় অবতীর্ণ। তিনি দু'জন সাক্ষীর পরিচয় নেবার পর, কখনো একজনের সামনে একজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন না। একজনকে বসাতেন, আর অন্যজনকে ওখান থেকে চলে যেতে বলতেন। একজনের সাক্ষী শেষ হবার পরই অপরজনকে ডাকা হত। দু'জনের সাক্ষী এক রকম না হলে তিনি বিয়ে পড়াতেন না। উকিল নিয়োগ, বা উকিলের বক্তব্য নিশ্চিত না হলেও বিয়ে পড়াতেন না। এমনকি দুলহাকে সুস্পষ্টভাবে কবুল কিয়া (কবুল করলাম) শব্দটি উপস্থিতির সামনে বলতে হতো। বিয়ের মজলিশে হুজুর কেবলাকে মনে হত তিনি যেন বিচারপতির এজলাশে বসে বিচার -বিবেচনা করছেন। ঠিক এ পদ্ধতির বিয়ে পড়াতেন চট্টগ্রাম জামেয়ার শাইখুল হাদিস মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী (রহ.), যা তিনি হুজুর কেবলার সাথে সাথে থেকে রপ্ত করেছিলেন। এখন আক্বদের এ স্পষ্টতা নিশ্চিত করে বিয়ে পড়ানোর বিষয়টি এই ঘরানার আলেমদের মধ্যে যথেষ্ট অনুসৃত হচ্ছে বলে মনে হয়।

চিঠিপত্রে দিক-নির্দেশনা

চিঠিপত্র মানব ইতিহাস-ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। জ্ঞানীর কলমের কালি'কে শহীদের রক্তের চেয়েও উত্তম বলা হয়েছে। তাই আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে চিঠিপত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রেখেছে, যদিও প্রযুক্তির জ্যামিতিক উন্নয়নের ধারায় এখন আর কাগজে কলমে চিঠিপত্র লেখার প্রয়োজন হচ্ছেনা বললেও চলে। কিন্তু ইতোপূর্বে, বিংশ শতাব্দিতে যাঁরা আমাদের ছেড়ে গেছেন, তাঁদের সময় পর্যন্ত এ সংস্কৃতি চালু ছিল, বলে সেই বিষয়টি সেই তখনকার একজন বহুল আলোচিত আধ্যাত্মিক-সংস্কারক ব্যক্তিত্ব হিসেবে, হযরত তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক, এবং তাঁর চিঠিপত্রাদি এখনও পরবর্তি প্রজন্মকে পথ দেখাতে সক্ষম। বিধায়, তাঁর এসব নিদর্শন সংরক্ষণ এবং বাংলায় প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় প্রকাশিত হওয়া দরকার বলে সচেতন মহল মনে করেন। কারণ, ইতোপূর্বে আলোচিত বিচার সংস্কৃতির উন্নয়নে তাঁর যে নির্দেশনা ছিল তাও কিন্তু চিঠির মাধ্যমে এসেছে। ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে (১৩৯৫ হিজরিতে ১২ রবিউল আউয়াল) তাঁর নির্দেশে যে 'জসনে জুলুস' প্রবর্তন আজ ইতিহাস হয়ে আছে, তাও কিন্তু চিঠির মাধ্যমে হয়েছে। গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র মত এত বড় একটি অরাজনৈতিক-আধ্যাত্মিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠার নির্দেশটিও হয় চিঠিতে। তাই, চিঠিপত্র আলোচনার বিষয়টি তৈয়্যব শাহ্ হুজুরের আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর চিঠি পেয়েই আনজুমান -জামেয়া কর্তৃপক্ষ, জামেয়ার লাইব্রেরী তল্লাশি চালায়, এবং দেখা যায় যে, হুজুর কেবলার কথাই ঠিক, সত্যিই জরুরি কিছু কিতাবপত্র পোকার আক্রমনে নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে। হুজুর কেবলার চিঠিতে সেই বিষয়টি না থাকলে, দ্রুততার সাথে লাইব্রেরীর কিতাবপত্র তল্লাশিও হতোনা, ফলে কিতাবগুলো রক্ষাও পেতনা। তাঁর একটা চিঠিতে পাওয়া

---

[১৫] প্রাগুক্ত

যায় এমন একটি রাজনৈতিক ভবিষ্যত বাণী, যা মাত্র কয়েকবছর পরই ঘটেছিল। সাবেক পরাশক্তি সোভিয়েত রাশিয়া যখন মহা দাপটে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছিল, সে সময়ে হুজুর কেবলা তৈয়্যব শাহ্’র চিঠিতে বলা হয় যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া) ভেঙ্গে যাবে শীঘ্রই, সেখান থেকে মুসলিম দেশগুলো বেরিয়ে আসবে। এরপর কি ঘটবে তা অলিআল্লাহরা ভাল জানেন’। আর, আনজুমান ট্রাস্ট’র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ মুহম্মদ মহসীন সাহেবের কাছে ১৯৮৭ সনে প্রদত্ত এবং তাঁর নিকট সংরক্ষিত, এই ঐতিহাসিক চিঠিটি ১৯৯৭ সনের এক রাতে যখন বলুয়ারদীঘি পাড়স্থ খানকাহ্ শরিফে পঠিত হচ্ছিল, তখন এ চিঠির ভবিষ্যত বাণী সত্যে পরিণত হয়ে সেই পরাশক্তি ভেঙ্গে গেছে, এবং ছয়টি মুসলিম দেশ এ সুযোগে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে স্বাধীন হয়ে যায়, সুবহানালাহ।[১৬]

বাংলাদেশের বৃহত্তম খানকাহ্ হল চট্টগ্রামের আলমগীর খানকাহ্ শরিফ। এটির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কেও ছিল গাউসে জামান তৈয়্যব শাহ্’র চিঠি, আর, এ চিঠিটিও এসেছিল বাগদাদ শরিফে সফরের সময়ে। এরূপ বহু চিঠিপত্র রয়েছে, যেগুলোর গবেষণা হুজুর কেবলা (র)’কে জানবার জন্য জরুরি। বিশেষ করে বলতে হয়, তাঁর চিঠির উপরিভাগে লেখা থাকত আল্লামা ইকবালের একটি কাসিদা ‘কি মুহম্মদ সে ওফা, তু নে তু হাম তেরে হ্যায়- ইয়ে জাঁহা চিজ হ্যায়, কেয়া লওহ কলম তেরে হ্যায়’

কাজী নজরুল ইসলামের ভাবানুবাদে এই কাসিদার অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ্ কে যে পাইতে চায়, হযরত কে ভালবেসে, আরশ কুরসি লওহ কলম, না চাইতে পেয়েছে সে’। তাঁর চিঠির উপরিভাগে অপর একটি কাসিদা শোভা পেত, সেটা হল ‘ওয়া সল্লাল্লাহু আ’লা নূরিন, কেজু শুধ নূরেহা পয়দা, জমি আজ হুব্বেও সাকিন, ফলক্ব দর এশক্বেও শায়দা’। নবীপ্রেমিকদের চিঠি সংস্কৃতি অন্যদের চেয়ে আলাদা হওয়া স্বাভাবিক। কারণ, আশেকারা মিল্লাত ও মাজহাব জুদাস্ত, প্রেমিকদের পথ-মত-ধর্ম সব আলাদা। তিনি নিজেকে খুব ছোট জানতেন বলে চিঠির নিবেদক হিসেবে লিখতেন না’চিজ, (বা অধম), মুহম্মদ তৈয়্যব, গুফেরালাহু। সুতরাং তাঁর চিঠিপত্রাদিতে আমাদের জন্য অমূল্য নিদর্শন রয়েছে।

সংস্থা -সংগঠন

সংস্থা-সংগঠন-প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র থেকে শুরু করে মানুষের যাবতীয় সৃষ্টিশীল কার্যক্রমকেই সংস্কৃতি বলেছেন বিশেষজ্ঞরা। তাই, আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি’র সাংগঠনিক অবদানের বিষয়টি আলোচিত না হলে প্রবন্ধটি অর্থবহ হবেনা মনে হচ্ছে। বিশেষত, প্রতিষ্ঠান-সংগঠনের মাধ্যমেই একজন প্রকৃত সংস্কৃতিবান ব্যক্তিত্বের সৃষ্টিগুলো পৌঁছে যাবে সমাজ, দেশ-দেশান্তরে এটাই স্বাভাবিক। তাই সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মাত্রই সাংগঠনিক মানসিকতা সম্পন্ন হবেন, এটাই সঙ্গত। গাউসে জামান তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি ছিলেন বরাবরই একজন সাংগঠনিক ব্যক্তিত্ব, তাই তাঁকে দেখা গেছে সংগঠন দরদী হিসেবে। স্বাধীনের পর তাঁর প্রথম বাংলাদেশ আগমন হয় ১৯৭৬ সনে। এ বছরের ১৬ ডিসেম্বরেই তিনি ‘মাসিক তরজুমান’ প্রকাশের সিদ্ধান্ত ঘোষণার সাথে সাথে সুন্নি ওলামাদের সংগঠিত করার পদক্ষেপ নেন। ৭ই জানুয়ারি ১৯৭৭ জামেয়া ময়দানে বাদে জুমা সে ওলামা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং একটি ‘আনুজমানে আহলে সুন্নাত’ নামক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ হয়। আর এ খবর তরজুমানের ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৮৮ সনে তাঁর নির্দেশে পূনরায় চট্টগ্রাম জামেয়ায় অনেক টাকা খরচ করে ওলামা সম্মেলন আয়োজন করেছিল আনজুমান ট্রাস্ট। আবারো কমিটি গঠিত হয়েছিল এগার বছর পর । যদিও সুন্নি ওলামাদের দিয়ে সাংগঠনিক লক্ষ্য অর্জিত হয়নি পরপর দুই পদক্ষেপ নেবার পরও। ১৯৮৩-৮৬ পর্যন্ত, তাঁর দোয়া ও প্রত্যক্ষ সমর্থনের কারণে, অরাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র সেনা’র গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। এই সময়েও তিনি ওলামাদের জাতীয় সংগঠনের তাগিদ দেন, কিন্তু তাও তাঁরা পারেননি। ১৯৮৬ সনের পর তিনি আর বাংলাদেশে তশরিফ আনলেন না। এবার তিনি নিজস্ব ত্বরিকত ভিত্তিক সংগঠনের দিকে নজর দিতে বাধ্য হলেন, চিঠি তে নির্দেশ করলেন, গাউসিয়া কমিটি গঠনের। আলহামদুলিল্লাহ্, গঠিত হল ‘গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ’, এটি কাজে নেমে গেল ১৯৮৭ হতে। এখন দুনিয়ার ত্রিশটি দেশে এর শাখা হয়েছে। বাংলাদেশের অন্তত পঞ্চাশটি জেলায় এর কমিটি রয়েছে। যেখানে সুন্নিয়ত-ত্বরিকতের বাতি নিভে গিয়েছিল অশুভ শক্তির ফুৎকারে, আজ সেখানেও দেখা যাচ্ছে সূফি সংস্কৃতির আলোর ছটা। বিশ্বময় ছড়াচ্ছে এ আলোর

---

[১৬]. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার ইসলামের মহান সংস্কারক, গাউসে জামান তৈয়্যব শাহ্ (র) শীর্ষক সেমিনার প্রবন্ধ, ২৭ এপ্রিল ১৯৯৮, চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন এবং গাউসুল আযম জিলানি: সংস্কার ও ত্বরিকা, পৃ ৭৬, ১৫ মে ২০০২, চট্টগ্রাম।

নিশান। গাউসিয়া কমিটির মাধ্যমে আজ আনজুমানের হাতে পরিচালিত হচ্ছে শতাধিক সুন্নি-সূফি চেতনার মাদরাসা। গাউসুল আযম দস্তগীর (রা)'র সৈনিকরা শীঘ্রই চষে বেড়াবে সমগ্র বিশ্ব, ইনশাল্লাহ্। হুজুর কেবলা তৈয়্যব শাহ্ বলেছিলেন, "মেরে বাচ্চা মাহ্দী আলাইহিস সালাম কা ফৌজ বনেগা, আউর দাজ্জাল কা সাথ জেহাদ করেগা" ইনশাল্লাহ্, সে মহান লক্ষ্যভেদ করতে এগিয়ে চলেছে এই কাফেলা। যারা প্রকৃত সূফি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে সমগ্র বিশ্বে পৌঁছে দিতে বদ্ধ পরিকর।

তাঁর আধ্যাত্মিক মর্যাদা

দরবারে আলিয়া কাদেরিয়া সিরিকোট শরিফের এ মহান সাজ্জাদানশীন আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র আধ্যাত্মিক মর্যাদা যে কত উপরে তা অনুধাবনের জন্য এই ঘটনাই যথেষ্ট, এক ভাগ্যবান জুতার দোকানি সব সময় জুতা বানিয়ে দিতেন তাঁর পীর সিরিকোটি হুজুরের জন্য। এবার তাঁর ইচ্ছা হল শাহজাদা তৈয়্যব শাহ্'র জন্যও এক জোড়া জুতা উপহার দেবেন। সিরিকোটি হুজুর, রেয়াজুদ্দিন বাজারের ঐ দোকানির ইচ্ছার কথা শুনে খুশী মনে ইজাজত দিলেন জুতা বানাতে। জুতার মাপ কত জানতে চাওয়ায় হুজুর বললেন আমার জুতার মত একই সাইজে বানালে হবে। কয়েকদিন পর, জুতা নিয়ে আসলেন সওদাগর। দেখে খুব খুশি হয়ে দোয়াও করলেন -হুজুর সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি। কিন্তু, জুতা বরাবর মাপ মত হল কি হলনা সেটা পরীক্ষা না করে সওদাগরের মনের খটকা যাচ্ছিল না। তাই, তিনি একটু আবদার করে বললেন, হুজুর জুতা আপনার মাপেই বানিয়েছি, তবু একটু আপনি যদি পায়ে দিয়ে দেখতেন বেশকম হলে ঠিক করে দিতে পারতাম। এতক্ষণ তাঁর চোখ মুখে ছিল আনন্দের ঝলক, আর এ আবদার শুনা মাত্রই তা নিমিষে হারিয়ে গেল, তাঁর চেহেরা লাল হয়ে গেল, বললেন -"খামোশ! মুজেহ্ হিম্মত নেহী হ্যায় তৈয়্যব কা জুতো পর পাও রাখেহ্, উনকা মকান বহুত উঁচা হ্যায়, তৈয়্যব মাদারজাত অলী হ্যায়, ইত্যাদি আরো বহু আধ্যাত্মিক মন্তব্য"। হযরত শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভান্ডারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছিলেন "হযরত তৈয়্যব শাহ্ ইসলামি জাহানের মস্তবড় হাস্তি, তিনি ইসলামকে জিন্দা করতে এসেছেন"[১৭]

কুমিল্লা - শাহপুর দরবারের পীর ডঃ আহমদ পেয়ারা বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি হুজুর কেবলা তৈয়্যব শাহ্ কে সবসময় প্রকাশ্যেই "গাউসে জামান "বলতেন। এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি স্বয়ং গাউসে পাকের মাজার পাক বাগদাদ শরিফে আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র একটি জিয়ারাত সফরের (সম্ভবত তাঁর ১৯৭৮ সনের বাগদাদ সফর) ঘটনা উল্লেখ করে বলেন -সেবার গাউসে পাক,বড়পীর, আবদুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহি আলায়হির মাজারের বিশেষ জায়গায় জেয়ারাতের অনুমতি পান হুজুর তৈয়্যব শাহ্। তাঁর অব্যবহিত পরের অনুমোদিত জেয়ারাতকারী ছিলেন আফ্রিকার একটি দেশের রাষ্ট্র প্রধান। সবার সময় সুনির্দিষ্ট। কিন্তু হুজুর কেবলা তৈয়্যব শাহ্ 'র সময় শেষ হবার পরও তিনি ভিতর হতে ফিরছেন না, আর ঐ দিকে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সিডিউল ভঙ্গ হবার উপক্রম, বারবার তাগিদ আসছে দায়িত্বশীল খাদেম হিসেবে ডঃ আহমদ পেয়ারা বাগদাদী সাহেবের প্রতি। তাই, তিনি নিরূপায় হয়ে, ভিতরে প্রবেশে বাধ্য হলেন, আর দেখলেন, হুজুর তৈয়্যব শাহ্ সে সময় বড়পীর গাউসুল আযম (রা) 'র সাথে সমগ্র জাহানের হিসাব -কিতাব নিয়ে ব্যস্ত, কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছেন, আর নতুন কিছু বুঝে নিচ্ছেন বড়পীর সাহেবের কাছ থেকে, এবং ঈঙ্গিত পেলেন আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ এই "জামানার গাউস" হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন --যার নিয়ন্ত্রণ মূলত বাগদাদ শরিফেই রয়েছে।[১৮]

তিনি একাধারে গাউসে জামান এবং চলমান শতাব্দির মুজাদ্দিদ হিসেবে সচেতন মহলে বিবেচিত হচ্ছেন।

হাদিস শরিফের এরশাদ মতে, প্রত্যেক শতাব্দির প্রারম্ভে দ্বীনের সংস্কার বা উন্নয়নের জন্য আল্লাহপাক এক বা একাধিক মুজাদ্দিদ পাঠাবেন। আল্লামা হক্কী রহমাতুল্লাহি আলায়হির মতে, মুজাদ্দিদের জন্ম এবং ওফাত একই শতাব্দিতে হবেনা, অর্থাৎ এক শতাব্দিতে জন্ম হবে, পরের শতাব্দিতে ওফাত হবে। ওফাতের শতাব্দি হিসেবেই তাঁকে সে হিজরি শতাব্দির মুজাদ্দিদ হিসেবে বিবেচনা করা হবে-

---

[১৭]. সৈয়দ ফরিদ উদ্দিন, মির্জাপুর, যিনি মাইজভান্ডার দরবার গাউসিয়া হক্ব মনজিলের সেই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ একজন, এবং অপরাপর কয়েকজন।

[১৮]. পীরে কামেল, ড : আহমদ পেয়ারা বাগদাদী সাহেবের বিশিষ্ট মুরীদ প্রফেসর ড : আল্লামা হুমায়ুন কবির, চেয়ারম্যান ইসলামিক স্ট্যাডিজ বিভাগ, টাঙ্গাইল সরকারি মোহাম্মদ আলি কলেজ, যিনি শত শত জনের সামনে এ কথা বহুবার বলেছেন, গত ১ এপ্রিল ২০১৮ টাঙ্গাইলের বাঘিলসহ খানকাহ্ শরিফ ও মাদ্রাসায় আবারো এই প্রসঙ্গ ও ঘটনাটির পূনরাবৃত্তি করেন।

যদি তাঁর হাতে দ্বীনের উল্লেখযোগ্য খেদমত হয়, যেমন, শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নয়ন ।

[আল্লামা জালালুদ্দিন সূয়ুতি, মিরকাতুস সাউদ শরহে সুন্নাতে আবু দাউদ]

আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হির দ্বীনি সংস্কার আজ প্রশ্নাতীত । তাঁর হাতে সুন্নিয়ত নতুন জীবন পেয়েছে । শিক্ষা-সংস্কৃতির অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। কাদেরিয়া ত্বরিকা, মসলকে আ'লা হযরত, সালাত-সালাম ব্যাপকতা পেয়েছে । মোটকথা, দ্বীনি সংস্কারে তাঁর দান অসামান্য । বিশেষত, শুধুমাত্র জসনে জুলুস প্রবর্তনের বিষয়টি বিবেচনায় আনলেও তাঁকে মুজাদ্দিদ বলা যায় । আর, জন্ম-ওফাতের যে শর্ত তাও তাঁর ক্ষেত্রে বরাবর মিলে যায় । তাঁর জন্ম ১৩৩৮-৪০ হিজরির দিকে,আর ওফাত হয় ১৪১৩ হিজরির ১৫ জিলহজ্ব, সোমবার, অর্থাৎ দুই শতাব্দি ব্যাপি জীবন তাঁর । যা, ইতোপূর্বের ১ম থেকে ১৪তম হিজরি শতাব্দি পর্যন্ত, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য এবং তালিকাভুক্ত মুজাদ্দিদগণের জীবন ও কর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ । সুতরাং ওফাতের শতাব্দি এবং অবদান বিবেচনায় তিনি চলতি হিজরি পঞ্চদশ শতাব্দির অন্যতম মুজাদ্দিদ হিসেবে ইতোমধ্যেই ব্যাপকভাবে আলোচিত ।

[দেখুন, মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, 'ইসলামের মহান সংস্কারক গাউসে জামান আল্লামা তৈয়্যব শাহ্, প্রকাশনায়, আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, ২৭ এপ্রিল ১৯৯৮]

উপসংহার

মূলত : হুজুর কেবলা তৈয়্যব শাহ্ (র) হলেন চলতি হিজরি শতাব্দির অন্যতম সংস্কারক ব্যক্তিত্ব। (দেখুন, প্রাগুক্ত সেমিনার প্রবন্ধটি) তাঁর সংস্কারের পরিধি অনেক বিস্তৃত, যা আলোচনা সময় সাপেক্ষ বিধায় উপেক্ষিত হল এখানে। তিনি ছিলেন অলি আল্লাহদের শ্রেষ্ঠতম আসন ‘গাউসে জামান’র দায়িত্বে ।

[আবদুল করিম, মুসলিম বাংরার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পৃ. -১৮৫, ৩৮/৪, বাংলা বাজার, ঢাকা । মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার মাতৃগর্ভের অলী, গাউসে জামান তৈয়্যব শাহ্ গ্রন্থটি ।]

তাঁর ছিল অসংখ্য কারামত, যা প্রবন্ধের কলেবর সীমিত রাখবার প্রয়োজনে বাদ রাখতে হল । পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেশে ছিল তাঁর অবদান। কিন্তু এখানে শুধু বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আলোচনায় এসেছে। যেমন, শুধু করাচিতেই আছে তার অন্তত ৪টি মাদরাসা ও কয়েকটি মসজিদ । সিরিকোট দরবারে আছে জামেয়া তৈয়্যবিয়া । রেঙ্গুনে বাগিয়া গার্ডেনে রয়েছে বার্মার সুন্নিদের জন্য একমাত্র মাদরাসা। সূফি-দরগাহ্-ওরস সংস্কৃতিতে তাঁর প্রদর্শিত আদর্শ সুন্নি মুসলমানদের পাথেয়, বাতিল অপশক্তির মুখে কুলুপ আটকাতে তাঁর পরিশীলিত ত্বরিকত সংস্কৃতির গ্রহনযোগ্যতা আজ প্রশ্নাতীত। তিনি ছিলেন ‘জিনকি হার হার আ'দা সুন্নতে মুসতফা’র মূর্ত প্রতীক। তিনি ছিলেন রাসুলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ৩৯ তম অধস্তন বংশধারার এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, এবং শাহানশাহে সিরিকোট রহমাতুল্লাহি আলায়হি’র সাজ্জাদানশীন ।

[দেখুন, সাজরা শরিফ, আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, চট্টগ্রাম প্রকাশিত]

লেখক: যুগ্ম মহাসচিব-গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, কেন্দ্রীয় পরিষদ ।

শরীয়তের দৃষ্টিতে হীলাহ্-ই ইসক্বাত্ব

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

পূর্ব প্রকাশিতের পর

ফিক্বহ্ ও উসূল-ই ফিক্বহ্‌বিদদের মতে হীলাহ্-ই ইসক্বাত

এ পর্যন্ত আমি হীলাহ্‌র অবস্থান শরীয়তে এবং মৌলিক হীলাহ্‌র বৈধতায় ক্বোরআন ও হাদীসের অকাট্য দলীলাদি পেশ করেছি। নিশ্চয় কোন মুসলমানই সেগুলো অস্বীকার করতে পারবে না। এখন আরো কিছু নির্ভরযোগ্য ও সনদসমৃদ্ধ কিতাবের আলোকে ‘হীলাহ-ই ইসক্বাত’-এর পক্ষে প্রমাণাদি উপস্থাপন করার প্রয়াস পাচ্ছিঃ

আল্লাহ্ তা‘আলার অনুগ্রহক্রমে আমি হীলাহ্-ই ইসক্বাতকে মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট করে দিয়েছি। এটাকে এখন কোন মুসলমান অস্বীকার করতে সক্ষম হবে না। কারণ, হীলাহ্ও দু’ প্রকার। সুতরাং ইমাম মুহাম্মদ সারাখসী আলায়হির রাহমাহ্ ‘আল মাবসূত্ব’-এ লিখেছেন-

فَالْحَاصِلُ اَنَّ مَا يَتَخَلَّصُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْحَرَامِ اَوْ يَتَوَصَّلُ بِه
اِلَى الْحَلَالِ مِنَ الْحِيَلِ فَهُوَ حَسَنٌ۔ وَاِنَّمَا يَكْرَهُ ذٰلِكَ اَنْ
يَّحْتَالَ فِىْ حَقِّ الرَّجُلِ حَتّٰى يُبْطِلَه اَوْ فِىْ بَاطِلٍ حَتّٰى يُمَوِّهَه اَوْ فِىْ
حَقٍّ حَتّٰى يُدْخِلَ فِيْهِ شُبْهَةً فَمَا كَانَ عَلٰى هٰذَا السَّبِيْلِ فَهُوَ
مَكْرُوْهٌ وَمَا كَانَ عَلَى السَّبِيْلِ الَّذِىْ قُلْنَا اَوَّلاً فَلَا بَأْسَ بِه لِاَنَّ
اللهَ تَعَالٰى قَالَ : وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَاتَعَاوَنُوْا عَلَى
الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ فَفِى النَّوْعِ الْاَوَّلِ مَعْنَى التَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوٰى وَفِى النَّوْعِ الثَّانِىْ مَعْنَى التَّاوُنِ عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
الخ… [اَلْمَبْسُوْط : الجلد :29۔30۔صفحه۔21

অর্থ: সারকথা হলো যে হীলাহ্‌র মাধ্যমে মানুষ হারাম থেকে বাঁচতে পারে অথবা হালাল পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, তা নিঃসন্দেহে ভাল। অবশ্য ওই হীলাহ্ মাকরূহ (অপছন্দনীয়), যার মাধ্যমে কারো হক্ব বিনষ্ট করা হয়, অথবা বাতিলকে নয়নাভিরাম বানানো হয় অথবা কারো হক্বে সন্দেহ সৃষ্টি করা হয়; ইমাম শামসুল আইম্মাহ্ সারাখসী রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলাযহি বলেন, প্রথম প্রকার তো নেকী ও পরহেযগারীতে সহযোগিতা করা, যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ ফরমান, ‘তোমরা সৎকাজ ও তাক্বওয়ার কাজে সহযোগিতা করো’’ আর দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে মন্দ ও গুনাহর কাজে সহযোগিতা, যা করতে ‘‘এবং তোমরা গুনাহ্ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করোনা’’ দ্বারা নিষেধ করা হয়েছে।

প্রমাণিত হলো যে, প্রত্যেক হীলাহ্‌কে অস্বীকার করা যাবে না। শুধু ওই হীলাহ্ নিষিদ্ধ, যা দ্বারা অপরের হক বিনষ্ট হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও যেসব লোক, হীলাহ্‌কে অস্বীকার করে, তাদের জন্য ইমাম সাহেবের নিম্নবর্ণিত বাণী যথেষ্ট। সুতরাং ওই ‘মাবসূত্ব’-এ উল্লেখ করা হয়েছে-

فَمَنْ كَرِهَ الْحِيَلَ فِى الْاَحْكَامِ فَاِنَّمَا يَكْرَهُ فِى الْحَقِيْقَةِ اَحْكَامَ
الشَّرْعِ وَاِنَّمَا يَقَعُ مِثْلُ هٰذِهِ الْاَشْيَآءِ مِنْ قِلَّةِ التَّاَمُّلِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আহকাম (শরীয়তের বিধানাবলী)-এ হীলাহ্‌গুলোকে অস্বীকার করে, সে প্রকৃতপক্ষে শরীয়তের বিধানাবলীকে অস্বীকার করে। এমন সব বিষয় চিন্তা-ভাবনায় কমতির কারণে হয়ে থাকে। [মাবসূত্ব: ২৯-৩০ খন্ড,পৃ. ২১০]

সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, যে কেউ বিধানাবলীতে হীলাকে অস্বীকার করে, মূলতঃ সে তার বুঝশক্তি ও চিন্তা-ভাবনায় কমতির কারণে তা করে থাকে। অন্যথায় পবিত্র শরীয়ত তো প্রত্যেক কিছুকে অত্যন্ত তাফসীল সহকারে ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। তাও তার জন্য, যে শরীয়ত ও শরীয়তের বিধানাবলী সম্পর্কে ওয়াক্বিফহাল। যদি ওয়াক্বিফহাল নাও হয়, তাহলে নিছক ‘ওয়াক্বিফহাল না হবার কারণে কোন শর‘ঈ হুকুমকে অস্বীকার করা উচিত নয়। এখন দেখুন ইমামগণের অভিমতগুলোর আলোকে প্রচলিত হীলাহ্-ই ইসক্বাত্বের প্রমাণ-

রোযার ফিদিয়া তো ক্বোরআন মজীদ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ ফরমায়েছেন-

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَه فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ

তরজমা: আর যাদের মধ্যে এর সামর্থ্য না থাকে তারা এর বিনিময়ে দেবে এক মিসকীনের খাবার।

[সূরা বাক্বারা: আয়াত-১৮৪, কানযুল ঈমান]

সম্মানিত ফক্বীহগণ বলেছেন, যখন ‘শায়খ-ই ফানী’ (মৃত্যুমুখী বৃদ্ধ)-এর পক্ষ থেকে রোযার ফিদিয়া আল্লাহর নিকট থেকে মঞ্জুর করা হয়েছে অথচ এটাও সম্ভব যে, যে

কোন সময় তার রোযা রাখার ক্ষমতা ফিরে পাবে, মৃত ব্যক্তি তো একেবারে অক্ষম হয়ে গেছে তার এ কথা বেশী বেশী প্রয়োজন যেন তার পক্ষ থেকে ফিদিয়া দেওয়া হয়। যদি সে ওসীয়ত করে যায়, তবে ওয়ারিসদের উপর তার ত্যাজ্য সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ থেকে না শুধু রোযার বরং নামাযগুলোর ফিদিয়াও প্রদান করা অপরিহার্য হবে। আর যদি ওসীয়ৎ করে না যায়; তবে ওয়ারিস নিজের পক্ষ থেকে নিজের সামর্থ্যানুসারে ফিদিয়া আদায় করতে পারে।

নামাযের ফিদিয়াকে রোযার ফিদিয়ার উপর ক্বিয়াস করা হয়নি; এ বিধান সতর্কতার অধীনে দেওয়া হয়েছে। যেভাবে 'শায়খ-ই ফানী' (অর্থাৎ যে ব্যক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ের দুর্বলতার কারণে রোযা রাখার সামর্থ্য রাখেনা এবং না ভবিষ্যতে শক্তি সামর্থ্য ফিরে পাবার আশা করা যায়) থেকে আল্লাহ্ তা'আলা রোযার বিনিময়ে ফিদিয়া কবূল করে নেন। অনুরূপ, যদি নামাযের বিনিময়ে ফিদিয়া কবুল করে নেন, তবে তা তাঁর মেহেরবাণী ও বদান্যতা থেকে দূরে নয়। আর এটাই উদ্দেশ্য। আর যদি নামাযের দিক থেকে কবূল না করেন, তাহলে সাদক্বাহর সাওয়াব তো যে কোন অবস্থায় পৌঁছাবে। যা কোন মুসলমানই অস্বীকার করতে পারে না।

বাদশাহ আলমগীরের ওস্তাদ মোল্লা জীবন রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর বিশ্ববিখ্যাত কিতাবে লিখেছেন-

وَالصَّلٰوةُ نَظِيْرُ الصَّوْمِ بَلْ اَهَمُّ مِنْهُ فِى الشَّانِ وَالرِّفْعَةِ فَاَمَرْنَا بِالْفِدْيَةِ عَنْ جَانِبِ الصَّلٰوةِ فَاِنْ كَفَتْ عَنْهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَبِهَا وَاِلَّا فَلَه ثَوَابُ الصَّدَقَةِ وَلِهٰذَا قَالَ مُحَمَّدٌ فِى الزِّيَادَاتِ تَجْزِئُه اِنْ شَآءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَالْمَسَائِلُ الْقِيَاسِيَّةُ لَا تَتَعَلَّقُ لَهَا بِالْمَشِيَّةِ الخ... [نور الانوار صفحه۔43 : بحث الامر]

অর্থ: নামায রোযার মত, বরং মান ও মর্যাদায় তদপেক্ষাও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য আমরা বলেছি নামাযের দিক থেকেও ফিদিয়া দেওয়া চাই। যদি এ ফিদিয়া আল্লাহর দরবারে নামাযের মতো মাকবূল হয়, তবে তো ভাল, অন্যথায় মৃত ব্যক্তি সাদক্বার সাওয়াব পেয়ে যাবে। এ জন্য ইমাম মুহাম্মদ 'যিয়াদাত'-এ বলেছেন, এ সদক্বাহ্ নামাযের দিক থেকে ইনশা-আল্লাহ্ যথেষ্ট হয়ে যাবে অথচ ক্বিয়াস সম্মত মাসআলায় ইনশা-আল্লাহ্ বলা হয় না।

'ইনশা-আল্লাহ' এ জন্য বলা হয়েছে যে, এটা সতর্কতার ভিত্তিতে ফয়সালা করা হয়েছে আর যে সব মাসআলা ক্বিয়াসের আলোকে বর্ণনা করা হয়, সেগুলোর সাথে 'ইনশা-আল্লাহ্' বলা হয় না। অনুরূপ, মোল্লা জীবন রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর 'তাফসীরাত-ই আহমদিয়া'তেও একথা বলেছেন।

বাকী রইলো ক্বোরআন মজীদের সাথে গম কিংবা নগদ টাকা এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে দেওয়া আর তৃতীয় ব্যক্তিকে দেওয়া, এ কাজ এ পরিমাণ বেশী হারে করা যে, সারা জীবনের ফরযসমূহের ফিদিয়ার পরিমাণ পূর্ণ হয়ে যায়। এ সম্পর্কে ফিক্বহর প্রসিদ্ধ কিতাব 'নূরুল ঈযাহ'র মধ্যে আছে, যদি কেউ কিছু মাল ফিদিয়া স্বরূপ প্রদানের ওসীয়ৎ করে আর ওই মাল তার ফরযগুলোর জন্য যথেষ্ট না হয় অথবা তার ত্যাজ্য সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশও যথেষ্ট হয় না, অথবা ওসীয়ত'ই করেনি, তাহলে মৃতকে দায়মুক্ত করার হীলাহ্ হচ্ছে এটা-

يُدْفَعُ ذٰلِكَ الْمِقْدَارُ لِلْفَقِيْرِ فَيَسْقُطُ عَنِ الْمَيِّتِ بِقَدْرِه ثُمَّ يَهَبُه الْفَقِيْرُ لِلْوَلِىِّ ثُمَّ يَدْفَعُ لِلْفَقِيْرِ فَيَسْقُطُ بِقَدْرِه ثُمَّ يَهَبُهُ الْفَقِيْرُ لِلْوَلِىِّ وَيَقْبِضُه ثُمَّ يَدْفَعُ الْوَلِىُّ لِلْفَقِيْرِ حَتّٰى يَسْقُطَ مَا كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ صَلٰوةٍ وَّ صِيَامٍ

অর্থ: ওলী ওই পরিমাণ অর্থ ফক্বীরকে দেবে। ফলে ওই পরিমাণ মৃতের দায়িত্ব থেকে ফরযসমূহ ঝরে যাবে। তারপর ওই ফক্বীর (ওই প্রাপ্ত) অর্থ ওলীকে হিবাহ্ (দান) করবে। আর ওলী তা করায়ত্ব করে আবার ফক্বীরকে দেবে। এর সমান ফরযসমূহ মৃতের দায়িত্ব থেকে ঝরে যাবে। ফক্বীর আবারও প্রাপ্ত অর্থ ওলীকে হিবাহ্ (দান) করবে। ওলী তা করায়ত্ব করে আবার ফক্বীরকে প্রদান করবে। এ পরম্পরা এ পর্যন্ত জারী থাকবে যেন মৃতের সমস্ত অনাদায়ী রোযা ও নামায ঝরে যায়।

[নূরুল ঈযাহ্, হাশিয়া-ই ত্বাহতাভী: পৃ. ২৬৩]

শীর্ষস্থানীয় ইমাম আল্লামা তাফতাযানী (ওফাত ৭৫২হি.) রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি উসূল-ই ফিক্বহ্র প্রসিদ্ধতর কিতাব 'তালভীহ্'-এ 'আদা ও ক্বাদ্বা' শীর্ষক আলোচনায় লিখেছেন-

فَقُلْنَا بِالْوُجُوْبِ اِحْتِيَاطًا۔ اَىْ لَا قِيَاسًا وَلَا دِلَالَةً لِاَنَّ الْمَعْنَى الْمُؤَثِّرَ فِىْ اِيْجَابِ الْفِدْيَةِ كَالْعِجْزِ مَثَلًا مَشْكُوْكٌ لَا مَعْلُوْمٌ اِلَّا اَنَّه عَلٰى تَقْدِيْرِ التَّعْلِيْلِ بِالْعَجْزِ تَكُوْنُ الْفِدْيَةُ فِى الصَّلٰوةِ اَيْضًا وَاجِبَةٌ بِالْقِيَاسِ الصَّحِيْحِ وَعَلٰى تَقْدِيْرِ عَدِيْمِ التَّعْلِيْلِ تَكُوْنُ حَسَنَةً مُنْدُوْبَةً تَمْحُوْ سَيِّئَةً فَيَكُوْنُ الْقَوْلُ بِالْوُجُوْبِ اَحْوَطُ وَيُرْجٰى قَبُوْلُهَا وَلِهٰذَا قَالَ مُحَمَّدٌ فِى الزِّيَادَاتِ فِىْ قِدْيَةِ الصَّلٰوةِ يَجْزِئُه اِنْ شَآءَ اللّٰهُ تَعَالٰى

অর্থ: আমি সতর্কতা স্বরূপ ওয়াজিব হবার কথা বলেছি। অর্থাৎ ক্বিয়াস ও দলীল দ্বারা নয়; কেননা উদাহরণস্বরূপ, অক্ষম হওয়া, ফিদিয়া ওয়াজিব হবার জন্য কারণ বা মাধ্যম

হওয়া নিশ্চিত নয়। যদি অক্ষমতা ‘কারণ’ হয়, তবে ‘সহীহ্ ক্বিয়াস’-এর ভিত্তিতে নামাযেও ফিদিয়া ওয়াজিব হবে। আর যদি সেটা ‘কারণ’ না হয়, তবে ফিদিয়া হবে উত্তম ও মুস্তাহাব এবং গুনাহ্গুলোকে নিশ্চিহ্নকারী। সুতরাং ওয়াজিব হবার কথায় সতর্কতা বেশী এবং সেটা কবুল হবার আশা জোরালো। এ জন্যই ইমাম মুহাম্মদ ‘যিয়াদাত’-এ নামাযের ফিদিয়া সম্পর্কে বলেছেন, ‘ইনশা-আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য যথেষ্ট হবে।’’

[আত্ তালভীহ্ ওয়াত্ তাওযীহ্, পৃ. ৪৬০, আদা ও ক্বাযা শীর্ষক অধ্যায়]

‘আত্ তালভীহ্’-এর পার্শ্ব/পাদটীকায় আছে-

اَمَّا اِذَا اَوْصَى الْمَيِّتُ فَبِالْاِتِّفَاقِ وَاَمَّا فِيْمَا يَتَبَرَّعُ بِه الْوَارِثُ بِلَا اِيْصَاءٍ فَفِيْهِ اِخْتِلَافٌ۔ فَقِيْلَ لَا يَسْقُطُ (اِلى اَنْ قَالَ) وَقِيْلَ يَسْقُطُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالى كَمَا فِى الْاِيْصَاءِ۔ لِاَنَّ دَلِيْلَ الْجَوَازِ الرَّجَاءُ اَيْ سَعَةُ رَحْمَتِه تَعَالى وَكَمَالِ كَرَمِه سُبْحَانَه وَذٰلِكَ يَشْمَلُ الْاِيْصَاءَ وَغَيْرَه۔ وَفِى النَّوَازِلِ سُئِلَ اَبُوْ الْقَاسِمِ عَنْ اِمْرَءَةٍ مَاتَتْ وَقَدْ فَاتَتْهَا صَلوَاتُ عَشَرَةِ اَشْهُرٍ وَلَمْ تَتْرُكْ مَالاً قَالَ وَلَوِ اسْتَقْرَضَ وَرَثَتُهَا قَفِيْزَ حِنْطَةٍ وَدَفَعَهَا مِسْكِيْنًا ثُمَّ يَهَبُهَا الْمِسْكِيْنُ بَعْضَ وَرَثِهَا ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى الْمِسْكِيْنِ فَلَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ كَذٰلِكَ حَتّى يَتِمَّ لِكُلِّ صَلوٰةٍ نِصْفُ صَاعٍ يَجْزِءُ ذٰلِكَ عَنْهَا كَذَا فِى التَّحْقِيْقِ الخ...

অর্থ: যখন মৃত ব্যক্তি ওসীয়ৎ করে যায়, তবে তাতে ঐকমত্য রয়েছে। আর যখন ওয়ারিস ওসীয়ৎ ব্যতীত নিজের সামর্থ্যানুসারে ফিদিয়া দেয়, তবে তা’তে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন এর ফলে দায়মুক্ত হবে না, আর কেউ কেউ বলেছেন, ‘‘ইনশা-আল্লাহ্ তা‘আলা দায়মুক্ত হয়ে যাবে; যেমন ওসীয়ৎ করার অবস্থায় দায়মুক্ত হয়ে যায়। কেননা, জায়েয হবার দলীল দৃঢ় আশা ও আল্লাহ্ তা‘আলার প্রশস্ত রহমতের পরিচায়ক আর এতে ওসীয়ৎ করা ও না করা উভয় শামিল রয়েছে।

‘নাওয়াযিল’-এ আছে আবুল কাসেমকে এমন এক মৃত মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, যার দশ মাসের নামায অনাদায়ী রয়ে গিয়েছিলো, সে কোন সম্পদও রেখে যায়নি। তিনি বলেন, যদি মৃতের ওয়ারিস এক ‘কফীয’ (পরিমাপ পাত্র বিশেষ) গম কর্জ নিয়ে মিসকীনকে দেয়, তারপর ওই মিসকীন ওই গমটুকু ওই মৃতের কোন ওয়ারিসকে দিয়ে দেয়, তারপর ওই ওয়ারিস মিসকীনকে সাদক্বাহ্ করে দেয়, অতঃপর এভাবে দিতেও নিতে থাকে যে পর্যন্ত না প্রত্যেক নামাযের জন্য অর্দ্ধ সা’ পূর্ণ হয়ে যায়, তবে তা ওই নারীর জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। গবেষণায় এমনটি স্পষ্ট হয়েছে...।

ইসক্বাত-এর হীলার বৈধতার পক্ষে উপরোক্ত দলীল প্রমাণগুলো যে কোন বিবেকবান ও বুঝশক্তি সম্পন্নের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এরপরও মনের প্রশান্তির জন্য আরো অতিরিক্ত কিছু দলীল-প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়াস পাচ্ছি। এতদ্সত্ত্বেও যদি কোন অস্বীকারকারী জেদের বশবর্তী হয়, তবে তা হলে তার জন্য শেখ সা’দী আলায়হির রাহমাহর এ পংপক্তিটা প্রযোজ্য হবে বৈ-কি।

گرنہ ؛ وز شپپر چشم ۔ پشمہ آفتا . راچہ گنہ

অর্থ: যদি বাদুড়ের চোখ সূর্য দেখতে না পায়, তবে তাতে সূর্যের বৃত্তটির দোষ কি?

তাযকিরাতুস্ সুলূক: পৃ.-৪, মুরাদাবাদে মুদ্রিত, উক্ত কিতাবে আছে-

وَلَعَلَّ اَكْثَرَ مَا تُعُوْرِفَ اَنَّه يُحَاسَبُ تَمَامُ عُمْرِه وَيَبِيْعُ مُصْحَفًا وَشَيْئًا اخَرَ بِمِقْدَارِهِمَا مِنَ الْفَقِيْرِ فَيَقْبِضُ الْفَقِيْرُ الْمَبِيْعَ وَيَصِيْرُ الْقَدْرُ الْمَذْكُوْرُ دَيْنًا عَلى ذِمَّتِه ثُمَّ يَقُوْلُ الْمُفْدِىْ اَعْطَيْتُكَ هٰذَا الْمِقْدَارَ مِنَ الْحِنْطَةِ فِىْ عِوَضِ فِدْيَةِ فُلَانِ الْمَيِّتِ وَيَقُوْلُ الْفَقِيْرُ قَبِلْتُ

অর্থ: লোকজনের মধ্যে যে কথাটা প্রসিদ্ধ তা হচ্ছে, প্রথমে মৃতের বয়স হিসাব করা হবে। তারপর রোযা ও নামাযের পরিমাণ অনুসারে ক্বোরআনের কপি ও গম (ফসল) ফক্বীরের নিকট বিক্রি করে ফেলবে। ফক্বীর ওই বিক্রিত জিনিষ নিজের করায়ত্বে নিয়ে তারপর ওলী-ওয়ারিসকে দেবে। এখন ওই উল্লেখিত পরিমাণ তার হাতে কর্জ হয়ে যাবে। তারপর ফিদিয়াদাতা ফক্বীরকে এভাবে বলবে, ‘‘আমি অমুক মৃতের (নামায, রোযার) ফিদিয়ার বিনিময়ে গমের এ পরিমাণ তোমাকে দিলাম।’’ আর ফক্বীর বলবে, ‘‘আমি কবুল করলাম।’’

ফাতাওয়া-ই শামীতে আছে-

ثُمَّ اعْلَمْ اَنَّه اِذَا اَوْصى بِفِدْيَةِ الصَّوْمِ وَالصَّلوٰةِ يُحْكَمُ بِالْجَوَازِ قَطْعًا لِاَنَّه مَنْصُوْصٌ عَلَيْهِ وَاَمَّا اِذَا يُوْصِىْ بِالْكَفَّارَةِ يُعْطى لِكُلِّ صَلوٰةٍ نِصْفُ صَاعٍ مَثَلاً وَيَدْفَعُ لِفَقِيْرٍ ثُمَّ يَدْفَعُ الْفَقِيْرُ لِلْوَارِثِ ثُمَّ وَثُمَّ حَتّى يَتِمَّ الخ...

অর্থ: অতঃপর জেনে রেখো, যদি মৃত ব্যক্তি রোযা ও নামাযের ফিদিয়া আদায় করার ওসীয়ৎ করে যায়, তবে সেটা জায়েয হবার অকাট্য হুকুম দেওয়া হবে। কেননা, ওসীয়ৎ পূর্ণ করার উপর ক্বোরআন ও হাদীসের পবিত্র বাণী (নাস্) রয়েছে। হ্যাঁ, যখন কাফ্ফারার ওসীয়ৎ করে যায়, তবে প্রত্যেক নামাযের জন্য কাফ্ফারা হিসেবে অর্দ্ধ সা’ (দু’ কে.জি. ৫০ গ্রাম) গম বের করে ফক্বীরকে দেওয়া

হবে। তারপর ওই ফক্বীর মৃতের ওয়ারিসকে দেবে। তারপর ওয়ারিস ফক্বীরকে দেবে। এ কাজ ততবার করা হবে যেন কাফ্ফারা পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

এখানেই রদ্দুল মুহতার: রোযার ইসক্বাত শীর্ষক পরিচ্ছেদেও এ ইসক্বাতের মাসআলা স্পষ্ট ও তাফসীল সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। কবীরীতে আছে-

وَمَنْ مَّاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ وَصَلوٰةٌ فَاَوْصٰى بِمَالٍ مُعَيَّنٍ يُعْطٰى لِكَفَّارَةِ صَلوٰتِه لَزِمَ وَيُعْطٰى لِكُلِّ صَلوٰةٍ كَالْفِطْرَةِ وَلِلْوِتْرِ كَذٰلِكَ۔ وَكَذَا الصَّوْمِ كُلِّ يَوْمٍ وَاِنَّمَا يَلْزَمُ تَنْفِيْذُ هَا مِنَ الثُّلُثِ۔ وَاِنْ لَّمْ يُوْصِ وَتَبَرَّعَ بِه بَعْضُ الْوَرَثَةِ (فَبِهَا) وَاِنْ كَانَتِ الصَّلَوَاتُ كَثِيْرَةً وَالْحِنْطَةُ قَلِيْلَةٌ يُعْطِى ثَلٰثَةَ اَصْوُعٍ عَنْ صَلوٰةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَعَ الْوِتْرِ مَثَلاً لِفَقِيْرٍ ثُمَّ يَدْفَعُهَا الْفَقِيْرُ اِلَى الْوَارِثِ ثُمَّ يَدْفَعُهُ الْوَارِثُ اِلَيْهِ وَهٰكَذَا يَفْعَلُ مِرَارًا حَتّٰى يَسْتَوْعِبَ الصَّلوٰةَ وَيَجُوْزُ اِعْطَائُهَا لِفَقِيْرٍ وَاحِدٍ دَفْعَةً بِخِلاَفِ كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ وَالظِّهَارِ وَالْاِفْطَارِ بِلاَ عُذْرٍ [صفحه 798۔ فصل قضاء القوث]

অর্থ: কোন মানুষ মৃত্যুবরণ করলো। তার দায়িত্বে কিছু রোযা ও কিছু নামায ছিলো; যেগুলো সে আদায় করতে পারেনি। সে তার সম্পদ থেকে একটা নির্দ্ধারিত পরিমাণের ওসীয়ৎ করলো যেন তার নামাযগুলো ও রোযাগুলোর কাফ্ফারা স্বরূপ ফক্বীর-মিসকনীদেরকে দেওয়া হয়। তাহলে এ ওসীয়ৎ পূরণ করা অপরিহার্য। সুতরাং বিতরগুলোসহ প্রত্যেক নামায ও প্রত্যেক রোযার জন্য সাদক্বাহ্-ই ফিতরের পরিমাণ অনুসারে আদায় করতে হবে। তার ত্যাজ্য সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে ওসীয়ৎ পূরণ করা হবে। যদি মৃত ব্যক্তি ওসীয়ৎ না করে আর ওয়ারিসদের মধ্য থেকে কেউ নিজের পক্ষ থেকে নিজেই তা সাদক্বাহ্ করে দেয় তবে তাও উত্তম। আর যদি নামায বেশী হয়; কাফ্ফারা প্রদানের অর্থ সম্পদ কম হয়, (তবে এ সমস্যার সামাধান এ যে), বিতরগুলোসহ একদিন ও রাতের নামাযগুলোর দিক থেকে তিন সা' (অর্থাৎ ৬ কে.জি. ১৫০ গ্রাম) কোন ফক্বীরকে দেওয়া হবে, তারপর ফক্বীর ওই অর্থ সম্পদ ওয়ারিসকে হিবাহ্ (দান) করবে। তারপর ওয়ারিস ফকিরকে দেবে। এভাবে বারংবার প্রদান ও গ্রহণ করতে থাকবে। এ পর্যন্ত কবরে যেন নামাযগুলোর কাফ্ফারা পূর্ণ হয়ে যায়। (এ কাফ্ফারার টাকা কিংবা গম) কোন ফক্বীরকে এক বারেও আদায় করা যায়। তবে ক্বসমের কাফ্ফারা এবং যিহারের কাফ্ফারা, অনুরূপ রোযা ভাঙ্গার কাফ্ফারাও একবারে ফক্বীরকে দেওয়া, কোন ওযর ব্যতীত জায়েয নয়।

ফাতাওয়া-ই আলমগীরীতে আছে-

اِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ صَلوٰةٌ فَائِتَةٌ فَاَوْصٰى بِاَنْ تُعْطٰى كَفَّارَةُ صَلوٰتِه نِصْفُ صَاعٍ حِنْطَةً وَلَوْ دَفَعَ اِلٰى فَقِيْرٍ وَاحِدٍ جَازَ بِخِلاَفِ كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ وَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْاِفْطَارِ وَفِى الْوَاجِبَةِ اَوْ دَفَعَ عَنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ تِسْعَ اَمْنَانٍ لِفَقِيْرٍ وَاحِدٍ يَجُوْزُ مِنْ اَرْبَعِ صَلوٰةٍ وَلاَيَجُوْزُ مِنَ الصَّلوٰةِ الْخَامِسَةِ [صفحه : 120 : ج۔ 1 : باب قضا والفوت ۔كذا فى جامع الرموز شرح مختصر الوقاية۔ ج۔ 1. صفحه۔ 21]

অর্থ: যখন কোন মানুষ মৃত্যুবরণ করে এবং তার দায়িত্বে কোন অনাদায়ী নামায থেকে যায়; আর সে ওসীয়ৎ করে যায় যেন তার নামাযের কাফ্ফারা অর্দ্ধ সা' হিসেবে (অর্থাৎ দু' কেজি ৫০ গ্রাম) গম ফক্বীরদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়। যদি ওই (কাফ্ফারা গম) একজন ফক্বীরকে সবটুকু দিয়ে দেওয়া হয়, তবুও জায়েয; তবে ক্বসমের কাফ্ফারা, যিহারের কাফ্ফারা এবং রোযা ভঙ্গ করার কাফ্ফারা এর ব্যতিক্রম। কেননা এ শেষোক্ত কাফ্ফারাগুলোতে একজন ফক্বীরকে সবটুকু দিয়ে দেওয়া জায়েয নয়। আর 'ওয়াজিবাহ্'র মধ্যে আছে যে, যদি কেউ পাঁচ ওয়াক্বতের নামাযের কাফ্ফারায় নয় মন (পরিমাপ পাত্র বিশেষ, যা অর্দ্ধ সা'র সম্পন্ন হয়) একজন ফক্বীরকেই দিয়ে দেয়; তবে এ কাফ্ফারা চার নামাযের দিক থেকে জায়েয হবে, অবশ্য পঞ্চম নামাযের দিক থেকে বিশুদ্ধ হবে না।

ফাতাওয়া-ই বারহানাহয় আছে-

یکے وفا کافت و٫ وے وصیت کفارہ کردہ ۔وار ش اوازہر نماز فرض نیم صاع گندم دہد از ثلث مال او ۔وا گرمال نز ناشتہ ۔نیم صاع قرض گیرد ۔وبفقیرے دہد وایں رابوے بخشد ۔بازاوبوے دہد وہمچناں ماتمام شود ۔وا گرہمہ یک فقیر رادہد ۔درس اس ۔وا گراز یک نماز برائے دو فقیر دہد روانہ باشدالخ.. [صفحہ-336]

অর্থ: কোন মানুষ মৃত্যুবরণ করলো। তার দায়িত্বে কয়েক ওয়াক্বতের নামায রয়ে গেছে। সে কাফ্ফারা আদায় করার ওসীয়ৎ করলো। তাহলে তার ওয়ারিস ত্যাজ্য সম্পত্তির

এক তৃতীয়াংশ থেকে প্রত্যেক ফরয নামাযের বিনিময়ে অর্দ্ধ সা’ গম পরিশোধ করবে।

আর যদি মৃত ব্যক্তি সম্পদ রেখে না যায়, তবে অর্দ্ধ সা’ পরিমাণ গম কর্জ নিয়ে কোন ফক্বীরকে দেবে। ওই ফক্বীর তাকে (ওয়ারিসকে) দান করবে। পুনরায় ওই ওয়ারিস তা ওই ফক্বীরকে দেবে। এ কাজটি ততবার করতে থাকবে, যতবারে কাফ্ফারা পূর্ণ হয়ে যায়।

যদি কাফ্ফারার ফিদিয়া সবটুকু একজন ফক্বীরকে দেয়, তবে তা দুরস্ত হবে। কিন্তু এক নামাযের ফিদিয়া দু’ ফক্বীরকে দেওয়া শুদ্ধ হবে না।

ত্বাহাভী শরীফে আছে-

فَمَا يُفْعَلُ الْاٰنَ مِنْ تَدْوِيْرِ الْقُرْاٰنِ مَعَ الْفِدْيَةِ لِلْكَفَّارَةِ بَيْنَ الْحَاضِرِيْنَ
وَكُلٌّ مِّنْهُمْ يَقُوْلُ لِلْاٰخَرِ وَهَبْتُ لَكَ هٰذِهِ الدَّرَاهِمَ لِلْاِسْقَاطِ مَا عَلٰى ذِمَّةِ
فُلَانٍ مِّنَ الصَّلٰوةِ وَالصِّيَامِ وَيَقْبَلُ الْاٰخَرُ صَحِيْحٌ۔ [ج۔1۔صفحه 308]

অর্থ: আজকালকার এ প্রচলন শরীয়তের দৃষ্টিতে শুদ্ধ; যা উপস্থিত লোকদের মধ্যে, ফিদিয়ার অর্থ সহকারে ক্বোরআন মজীদের কপি কাফ্ফারা স্বরূপ বারংবার দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলবে, ‘‘অমুকের দায়িত্বে যেসব নামায, রোযা অনাদায়ী রয়ে গেছে, সেগুলোর ইসক্বাত্বের জন্য এ নগদ অর্থ আমি তোমাকে দান করলাম,’’ অপরজন বলবে, ‘‘আমি কবূল করলাম।’’ [প্রথম খন্ড: ৩০৮পৃ.]

অনুরূপ ‘ফাতাওয়া-ই সমরকন্দী’তে আছে-

عَنْ اِبْنِ عَوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ
اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ! اِجْعَلُوْا الْقُرْاٰنَ وَسِيْلَةً اِلٰى نَجَاةِ مَوْتَاكُمْ
فَتَحَلَّقُوْا وَقُوْلُوْا! اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِهٰذَا الْمَيِّتِ بِحُرْمَةِ الْقُرْاٰنِ۔
وَتَنَاوَلُوْا بِاَيْدِيْكُمْ مُتَنَاوِبَةً وَفَعَلَ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فِىْ اٰخِرِ
خِلَافَتِه لِاِمْرَأَةٍ مُلَقَّبَةٍ بِحَسِيْنَةِ بِيْتِ عَرْبَدْ زَوْجَةِ مَلَابٍ
بِجُزْءٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ مِنْ وَمَالِىْ اِلٰى عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ فِىْ حَلْقَهٖ
عِشْرِيْنَ رَجُلًا وَمَا شَاعَ ذٰلِكَ فِىْ خِلَافَةِ عُثْمَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ
لِاِنْكَارِ مَرْوَانَ۔ اِنْتَهٰى۔ وَقَدْ شَاعَ فِىْ زَمَانِ هَارُوْنَ الرَّشِيْدِ

[فتاوى سمر قفدى: ج۔3۔صفحه۔199]

অর্থ: হযরত ইবনে ‘আউন থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু বলেন, ‘‘হে মু’মিনগণ! তোমাদের মৃতদের জন্য ক্বোরআন মজীদকে নাজাতের জন্য ওসীলাহ্ বানাও! আর একে অপরের হাত ধরে বৃত্ত বানাও! আর এভাবে বলো, ‘‘হে আল্লাহ্! এ ক্বোরআন-ই পাকের ওসীলায় এ মৃতের গুনাহ্ ক্ষমা করুন!

সাইয়্যেদুনা ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু তাঁর খিলাফতের শেষ প্রান্তে এক মহিলা হাসীনাহ্ বিনতে ‘আব্বাদের ওফাতের পর বিশজন লোকের মজলিসে عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ থেকে وَمَالِىَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِى পর্যন্ত পড়ে হীলাহ্ করেছেন। আর হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুর খিলাফতকালে মারওয়ানের চক্রান্তের কারণে এ আমল সাধারণভাবে প্রচলিত হয়নি। তারপর বাদশাহ্ হারূন রশীদের আমলে এটা প্রসিদ্ধ হয়েছে। [তৃতীয় খন্ড: ১৯৯পৃ.]

সুতরাং আজকালও কিছু লোক মারওয়ানের কুপ্রথার অনুসরণ করতে গিয়ে সেটাকে বন্ধ করার কিংবা নিঃশেষ করার জন্য তৎপর হয়েছে; কিন্তু আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের দমন করার জন্য কোন না কোন হারূন রশীদ পয়দা করে দেন। لِكُلِّ فِرْعَوْنَ مُوْسٰى (প্রত্যেক ফিরআউনের ধ্বংসের জন্য একজন মূসা রয়েছেন।)

হীলাহ-ই ইসক্বাতের বৈধতা সম্পর্কে জানার জন্য নিম্নলিখিত কিতাবগুলোরও পাঠ-পর্যালোচনা করা যেতে পারেঃ

১. ত্বাহত্বাভী ‘আলা মারাক্বিল ফালাহ্:পৃ. ৩৫৪।
২. মাজমা‘উল আনহার: ১ম খন্ড: পৃ.২৫০।
৩. ফাত্হুল কালাম: পৃ. ২৯।
৪. ফাতাওয়া হুমায়ূন: ১ম খন্ড, পৃ ৯০।
৫. মারজা‘উ আহলিল হায়াতে ‘ইনদা যিক্রি আহলিল মামাত: পৃ. ১৮৫।
৬. যাদুল আখিরাত: পৃ. ৫৬

উপরোক্ত ফাতাওয়া ও সেগুলোর ইবারতগুলোর সারকথা ও মর্মার্থ এ যে, হীলাহ্-ই ইসক্বাত এ পদ্ধতিতে, অর্থাৎ নগদ টাকা ও ফসল ক্বোরআন মজীদের কপি সহকারে কমপক্ষে তিনবার ঘুরানো যেতে পারে। কারণ, এ উত্তম কাজ মৃতের জন্য তার অনাদায়ী নামায-রোযার কাফ্ফারা হয়ে যায়।

তাছাড়া, যদি মৃতের অসুস্থাবস্থায় কিছু নামায, রোযা হাতছাড়া হয়ে যায় (অনাদায়ী থেকে যায়), আর মৃত ব্যক্তি এ পরিমাণ সম্পদও রেখে যায়নি যে, ওই ত্যাজ্য সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ থেকে নামায রোযার কাফ্ফারা হতে পারে,

আর মৃত ব্যক্তি কাফ্ফারা দেওয়ার জন্য ওসীয়ৎও করে যায়, তবে ওলী-ওয়ারিসের উপর অপরিহার্য হচ্ছে বিতরসহ প্রত্যেক নামায ও রোযার বিনিময়ে দু' কে.জি. ৫০ গ্রাম গম ফক্বীর-মিসকিনকে দেওয়া। আর যদি মৃতের ত্যাজ্য এক তৃতীয়াংশ সম্পদ এ পরিমাণ না হয়, অথবা সে ওসীয়ৎ করে যায়নি, আর মৃতের ওলী নিজের পক্ষ থেকে তার কাফ্ফারা পরিশোধ করতে চায়, যদি তা তার জন্য জরুরী নয়; কিন্তু সব নামায-রোযা (যেগুলো অনাদায়ী থেকে গেছে)-এর কাফ্ফারা দিতে না পারে, তবে এ পদ্ধতিতে ওই সম্পদ বা অর্থ কড়িকে তিন/চারবার প্রয়োজনানুসারে ফক্বীর-মিসকীনের মধ্যে ঘুরাবে, তাও এভাবে যে, ওলী একজনকে দান করবে, সে অপরজনকে, আর সে তৃতীয় জনকে, এ নিয়মে, এ পর্যন্ত মৃতের সমস্ত অনাদায়ী নামায-রোযার কাফ্ফারার পরিমাণ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এ আমল সাওয়াবের কারণ।

আর যদি মৃত ব্যক্তি ধনবান হওয়া সত্ত্বেও ওসীয়ৎ করেনি, অথবা কাফ্ফারার পরিমাণ অপেক্ষা কম পরিমাণ মাল-সম্পদ দেওয়ার ওসীয়ৎ করে যায়, তবে সে গুনাহ্গার হবে।

এ সব কথা উপরোক্ত দলীল-প্রমাণ (ক্বোরআন, সুন্নাহর উদ্ধৃতি)'র সার কথা।

অনুরূপভাবে, ইমাম সুয়ূত্বীর 'জামে'উস সগীর' ৩য় খন্ড: ১৯৯পৃ. ফাতাওয়া-ই সমরক্বন্দী এবং 'তাহক্বীক্বুল মাসাইল'-এ শরীয়তসম্মত 'হীলাহ-ই ইসক্বাত্ব' সম্পর্কে অতি উত্তমভাবে, দলীল-প্রমাণসহকারে, বিস্তারিতভাবে তৃপ্তিদায়ক আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং নিশ্চয় কোন হানাফী মুসলমান এতগুলো অকাট্য দলীল-প্রমাণ, মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল থাকা সত্ত্বেও 'হীলাহ-ই ইসক্বাত'-এর বৈধতাকে অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু-

آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشہ دیکھے
دیدہ کور کو کیا آئے نظر-کیا دیکھے

অর্থ: চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই তো তোমার যৌবনের তামাশা দেখতে পায়। অন্ধ লোকের কি দৃষ্টিগোচর হবে? কি দেখতে পাবে সে?

আল্লাহ্ তা'আলার মহান দরবারে প্রার্থনা, তিনি যেন আপন মাহবূব-ই মুকাররম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওসীলায় প্রত্যেক মুসলমানকে হিদায়তের পথে আজীবন প্রতিষ্ঠিত রাখেন। আ-মী-ন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

هٰذَا مَا ظَهَرَ لِىْ فِىْ هٰذَا الْبَابِ وَاللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ
بِالصَّوَابِ وَعِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ وَاِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَاٰبُ

(আলোচ্য) বিষয়ে আমার নিকট এতটুকু সুস্পষ্ট হয়েছে, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা সর্বাধিক সঠিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাতা। তাঁর নিকট রয়েছে উত্তম সাওয়াব (প্রতিদান) এবং তাঁরই দিকে সবার প্রত্যাবর্তন ও ঠিকানা।

গ্রন্থপঞ্জী

- ক্বোরআনুল করীম
- হাদীস শরীফ
- হীলাহ-ই ইসক্বাত কী শর'ঈ হায়সিয়াত, কৃত. মাওলানা ইফতিখার আহমদ হাবীবী, কোয়েটা, বেলুচিস্তান।
- ওয়াজীযুস্ সেরাত্ব
- আল-আশবাহ্ ওয়ান নাযা-ইর।
- আল-মাবসূত্ব
- নূরুল আন্ওয়ার
- আত্-তালভীহ্ ওয়াত্ তাওযীহ্
- তাযকিরাতুস্ সুলুক
- রদ্দুল মুহতার (শামী)
- ফাতাওয়া-ই আলমগীরী
- ফাতাওয়া-ই বারহানাহ্
- ফাতাওয়া-ই সমরকন্দী
- তাহত্বাভী 'আলা মারাক্বিল ফালাহ্
- নূরুল ঈযাহ্।

লেখক: মহাকলাচরপি-আনজুমান রিসার্চ সেন্টার, চট্টগ্রাম।

‘সালেহীন’(সৎকর্মশীলগণ)’র গুণাবলী ও সেগুলোর প্রভাব

মাওলানা মুহাম্মদ আবুল হাশেম

আল্লাহ তা‘আলার পুণ্যবান ও প্রিয় বান্দাগণের একটি স্তর হচ্ছে, ‘সালেহীন’-এর। ‘সালেহীন’ নাম দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, এ ব্যক্তিবর্গের জীবন ‘আ’মাল-ই সোয়ালিহাহ্’ তথা সৎকর্মসমূহ দ্বারা পরিচিত হয়ে থাকে। তাঁরা কুপ্রবৃত্তির অভ্যাস’র পরিবর্তে আল্লাহ তা‘আলা এবং তাঁর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র হুকুম-আহকাম অনুসরণ করেন। এ নিবন্ধে সালেহীন তথা সৎকর্মশীলদের জীবন-চরিত এবং ভূমিকার মৌলিক গুণাবলি এবং সেগুলোর প্রভাবসমূহ উল্লেখ করা হবে, যাতে তা দ্বারা যেমনিভাবে আমাদের মধ্যে সালেহীন’র গুণাবলি সৃষ্টি হয়, অনুরূপ তাদের বাণীসমূহ, কর্মকান্ডগুলোর অনুসরণ ও সঙ্গ দ্বারাও নিজেদেরকে ফয়যপ্রাপ্ত করার প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হবে। নিচে ক্বোরআনুল হাকীম ও আহাদীস-ই মুবারকা’র আলোকে ‘সালেহীন’র গুণাবলি তুলে ধরা হচ্ছে-

০১.কুপ্রবৃত্তির কামনা-বাসনা থেকে বিরত থাকা

আউলিয়া-উল্লাহ্ ও সালেহীন’র মৌলিক ও প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাঁরা কুপ্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে পরিপূর্ণ ত্যাগ করেন। সালেহীন স্বীয় প্রবৃত্তির ইচ্ছাগুলোকে আল্লাহ তা‘আলার আহকামের অনুগত করে দেন। কারণ তাদের জানা আছে যে, প্রবৃত্তির ইচ্ছা ও অভিলাষসমূহের অনুসরণ করা মানে সেগুলোকে মা’বূদ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া। আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত এরশাদ করেন:

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ. (الفرقان، 25: 43)

‘আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে স্বীয় কামনা-বাসনাকেই আপন খোদা স্থির করে নিয়েছে?’ (সূরা আল্ ফোরক্বান, ৪৩)[১৯]

হুযূর **গাউসুল আ’যম** শায়খ আবদুল ক্বাদের জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করার আলামত এভাবে বর্ণনা করেছেন:

‘উপকার ও ক্ষতি, মন্দ ও অনিষ্ট দূর করা, দুনিয়াবী কারণসমূহ ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা’র সকল বিষয়ে স্বীয় সত্ত্বার উপর ভরসা করার পরিবর্তে সেসব বিষয়কে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ তা‘আলার উপর সৌপর্দ করা হবে এবং তাঁকেই চাহিদাদি পূরণকারী হিসেবে মেনে নিবে। আর খোদা তা‘আলাকে ‘মুখতার-ই কুল’ (সবকিছু তাঁরই ইচ্ছাধীন) না মেনে স্বীয় আত্মার উপর নির্ভর করা-ই শিরক্।’

এরপর আরো এরশাদ করেন: ‘প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা পরিহার করলে আল্লাহ তা‘আলার কর্ম তোমার উপর জারি হবে, ইলাহী কর্মসমূহ বাস্তবায়ন হওয়ার সময় তোমার অঙ্গগুলো স্থির ও নীরব হবে। অন্তর সন্তুষ্ট হবে, বক্ষ প্রশস্ত হবে, চেহারা আলোকিত ও নূরানী হবে এবং তুমি আল্লাহর সাথে সম্পর্কের রূহানী শক্তিতে বলিয়ান হয়ে সৃষ্টিজগতের সকল বস্তু থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যাবে।’[২০]

সুতরাং ‘সালেহীন’ (সৎকর্মশীলগণ) প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাগুলোর অনুসরণ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেন, কেননা এসব কামনা-বাসনা-ই হত্যাকাণ্ড, ব্যভিচার, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়াসহ সকল পাপের মূলভিত্তি।

০২.দো‘আ ও মুনাজাত

আউলিয়া-উল্লাহ্ ও সালেহীন’র আল্লাহ তা‘আলার ‘যাত’ (সত্ত্বা)’র সাথে গভীর সম্পর্ক হয়। তাঁরা প্রতিটি ক্বদম ও পর্যায়ে আল্লাহ তা‘আলার নিকট দো‘আ করেন। এটা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর বান্দা অহংকার থেকে মুক্ত হন। এ কারণে তারা নিজেদেরকে হীন জ্ঞান করেন এবং আল্লাহ তা‘আলাকে সুমহান ও সর্বোন্নত মনে করে তাঁর সাথে দো‘আ ও মুনাজাতের সম্পর্ককে মজবুত করেন। ক্বোরআনুল হাকীমের বর্ণনা নিম্নরূপ:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ.

‘এবং ওই সব লোক, যারা আরয করে, হে আমাদের রব! আমাদের দিক থেকে ফিরিয়ে দিন জাহান্নামের শাস্তিকে।’[২১]

হুযূর সায়্যিদুনা **গাউসুল আ’যম** রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু স্বীয়গ্রন্থ ‘ফুতূহুল গায়ব’-এর মধ্যে বলেন, “এটা কখনো বলিও না যে, আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবো না; কেননা প্রার্থনা করা যদি দূষনীয় ও নিষিদ্ধ হয়, তাহলে

---

[১৯] আল্ ক্বোরআন, সূরা (২৫) আল্ ফোরক্বান, আয়াত: ৪৩

[২০] ফুতূহুল গায়ব: ১৫

[২১] আল্ ক্বোরআন, সূরা (২৫) আল্ ফোরক্বান, আয়াত: ৬৫

সেটা সৃষ্টিকুলের সামনে হবে, নয় সেটা স্রষ্টা ও প্রতিপালকের সামনে। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট স্বীয় সমস্ত চাহিদা ও প্রয়োজনের জন্য প্রার্থনা করা এবং ধারবাহিকভাবে দো'আ করা বান্দার জন্য সৌভাগ্যের কারণ এবং ঈমানের এককত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ।"[২২]

০৩.উন্নত চরিত্রের ধারক

সালেহীন'র অন্যতম গুণ হচ্ছে, তাঁরা উন্নত ও অনুপম চরিত্রের ধারক হন। তাঁদের কিছু চরিত্র মাধুর্য সম্পর্কে ক্বোরআনুল হাকীম'র বর্ণনা হচ্ছে-

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا
خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا–

'এবং রাহমানের ওই বান্দাগণ, যারা ভূ-পৃষ্ঠে ধীরগতিতে চলাফেরা করে এবং যখন অজ্ঞব্যক্তিরা তাদের সাথে কথা বলে তখন বলে, 'ব্যাস্ সালাম।'[২৩]

অপর এক স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন:

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

'এবং যেসব লোক মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না; আর যখন অনর্থক কার্যকলাপের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে, তখন তারা স্বীয় সম্মানকে রক্ষা করে অতিক্রম করে।'[২৪]

এ আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর বান্দাগণ অহমিকা ও আমিত্ব প্রদর্শনকারী হন না বরং বিনয়ী স্বভাবের হন। সেটার বহিঃপ্রকাশ তাঁদের চলাচলের ধরন দ্বারা হয়। অপর একটি গুণ এও রয়েছে যে, তাঁরা অজ্ঞদের সাথে বিবাদে জড়ান না, বরং অজ্ঞব্যক্তিদের বিবাদ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রেও কোন উত্তর না দিয়ে, বরং তাদের জন্য 'সালামতী' (নিরাপত্তা)'র দো'আ করতে করতে তাদেরকে এড়িয়ে যান। অনুরূপ বাতিল ও মিথ্যা মজলিসগুলো পরিহার করেন। আর যখন অনর্থক ও উদ্দেশ্যহীন কার্যকলাপের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন, তখন সম্মানের আঁচল বাঁচিয়ে অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্য বজায় রেখে অতিক্রম করে যান।

হুযূর **গাউসুল আ'যম** রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অহংকার সম্পর্কে বলেন: " তোমার নিজ নেকীসমূহ নিয়ে গর্ব করা, সেসব নেকীকে নিজের আত্মার প্রতি সম্পর্কিত করা এবং খোদার সৃষ্টির মধ্যে নিজের দ্বীনদারির উপর অহংকার করে চলা স্পষ্ট শিরক্ ও গোমরাহী। প্রকৃতপক্ষে 'সিরাতুল মুস্তাকীম''র উপর চলা এবং নেকীসমূহের সামর্থ আল্লাহ তা'আলার-ই সামর্থ, তাওফীক্ব, অনুগ্রহ ও দয়ায় হয়।"[২৫]

অতএব জানা গেল যে, 'সালেহীন' তথা সৎকর্মশীলগণ বিনয়ী স্বভাবের হন এবং তাঁদের সকল কথা ও কর্ম অহংকার থেকে সুরক্ষিত হয়।

০৪.'ইস্তিক্বামাত' (সঠিক পথে স্থিরতা)

আল্লাহ তা'আলার পুণ্যবান বান্দাগণের একটি গুণ হচ্ছে, 'ইস্তিক্বামাত' (সঠিক পথে স্থিরতা)। সেটাকে ক্বোরআনুল হাকীম এ শব্দাবলির মাধ্যমে বর্ণনা করছে,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا– (حم السجدة، 30:41)

'নিশ্চয় ওই সব লোক, যারা বলেছে, 'আমাদের রব আল্লাহ্' অতঃপর সেটার উপর স্থির রয়েছে, তাদের উপর ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়। (আর বলে,) 'না ভীত হও এবং না দুঃখ করো।'[২৬] এ আয়াতে 'ইস্তিক্বামাত' (সঠিক পথে স্থিরতা) মূল স্তম্ভের ভূমিকা পালন করছে, অনুকুল ও প্রতিকুল অবস্থাদিতে কোন কর্মে অটল-অবিচল থাকা-ই 'ইস্তিক্বামাত'। হাদীসে পাকে স্থায়ী কর্মকে পছন্দনীয় হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। ইমাম বোখারী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি 'أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَدْوَمُهُ'- এ অধ্যায়ের আওতাধীন একটি হাদীস শরীফ বর্ণনা করেন, وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ 'আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাদিক পছন্দনীয় হচ্ছে ওই আমল, যার সম্পাদনকারী সেটা স্থায়ীভাবে করে থাকে।'[২৭]

কিতাব ও সুন্নাহ থেকে জানা যায় যে, দ্বীনের মধ্যে 'ইস্তিক্বামাত'র খুবই গুরুত্ব রয়েছে। আম্বিয়া-ই কিরামের মধ্যে 'ইস্তিক্বামাত' সর্বাধিক পরিপূর্ণ পাওয়া যায়, অনুরূপ আউলিয়া-ই কিরামের মধ্যেও 'ইস্তিক্বামাত'র গুণ বিদ্যমান থাকে। এ কারণে বালা-মুসীবত ও জটিল সমস্যাগুলো তাদের 'ইস্তিকামাত'-এর মধ্যে কোন অসংগতি সৃষ্টি

---

[২২] ফুতূহুল গায়ব: ১১৩

[২৩] আল্ ক্বোরআন, সূরা (২৫) আল্ ফোরক্বান, আয়াত: ৬৩

[২৪] প্রাগুক্ত, আয়াত: ৭২

[২৫] ফুতূহুল গায়ব: ১২০

[২৬] আল্ ক্বোরআন, সূরা (৪১) হা-মীম আস্ সাজ্‌দাহ্, আয়াত: ৩০

[২৭] বোখারী, আস্ সহীহ্, কিতাবুল ঈমান, খন্ড-১, পৃ. ১৭, হা. নং- ৪৩

করতে পারে না। সত্যের পথে এমন ‘ইস্‌তিক্বামাত’ তাঁদের সুমহান ব্যক্তিত্বের দলীল হয়। তাসাওফের মধ্যে ‘ইস্‌তিক্বামাত’কে কারামত’র চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে গণ্য করা হয়। সুফীগণের নিকট এটাকে الاستقامة فوق الكرامة (ইস্‌তিক্বামাত কারামাতের উপর মর্যাদাবান)-এ শব্দাবলি দ্বারা বর্ণনা করা হয়।

০৫.তাক্বওয়া

সূরা ইয়ূনুস-এর মধ্যে আউলিয়া-উল্লাহ’র মৌলিক গুণ তাক্বওয়াকে এ শব্দাবলির মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে-

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ- الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ- لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

‘শুনে নাও! আল্লাহর ওলীগণের না কোন ভয় আছে, না কোন দুঃখ; ওই সব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং খোদাভীতি অবলম্বন করে; তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনে এবং পরকালে। আল্লাহর বাণীগুলো পরিবর্তিত হতে পারে না। এটাই হচ্ছে মহাসাফল্য।’[২৮]

এ আয়াতের মধ্যে আউলিয়া-উল্লাহ’র দু’টি মৌলিক গুণ, যথা ‘ঈমান’ ও ‘তাক্বওয়া’র বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। ‘**كَانُوا يَتَّقُونَ**’ ব্যাকরণের দিক থেকে ‘ماضى استمرارى’ (অতীতকালে কোন কাজ চলমান পাওয়া যাওয়া) এটার অর্থ হচ্ছে, তাঁদের সম্পূর্ণ জীবন তাক্বওয়া দ্বারা পরিচিত হয়। কোন আমল লাগাতার ও ধারাবাহিকভাবে হওয়াকে-ই জীবন চরিত ও ব্যক্তিত্ব বলে বিবেচনা করা হয়। তাক্বওয়ার মধ্যে কুফর ও শির্ক, সগীরা ও কবীরা গুনাহসমূহ, সন্দেহযুক্ত বিষয়াদি থেকে বিরত থাকাও অন্তর্ভূক্ত। এসব বিষয় থেকে বেঁচে থেকে জীবন অতিবাহিত করা ‘বিলায়ত’ অর্জনের জন্য মৌলিক শর্ত হিসেবে আখ্যায়িত।

হুযূর **গাউসুল আ’যম** শায়খ আবদুল ক্বাদের জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু তাক্বওয়া সম্পর্কে বলেন: “রাহ্-ই সুলূক’ (আধ্যাত্মিকতা অর্জনের পথ)’র মধ্যে প্রথম প্রদক্ষেপ হচ্ছে, তাক্বওয়া এবং দ্বিতীয় প্রদক্ষেপ হচ্ছে, ‘হালত-ই বিলায়ত’ (বিলায়তের অবস্থা)। আর যতক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ তাক্বওয়া অর্জ করা হবে না, বিলায়তের মর্তবা অর্জন অসম্ভব।”[২৯]

হযরত **বায়েযীদ বোস্তামী** রাহমাতুল্লাহি আলায়হির মতে, “বিলায়তের মানদন্ড হচ্ছে, পরিপূর্ণ শরী’আতের অনুসরণ, আদেশ-নিষেধ মেনে চলা, আল্লাহ্ প্রদত্ত সীমা সংরক্ষণ করা এবং সুন্নাতের অনুসরণ।”

মোটকথা, কুপ্রবৃত্তির কামনা-বাসনা থেকে বিরত থাকা, ইবাদত-রিয়াযত, মধ্যমপন্থা অবলম্বন, চিন্তা-গবেষণা, দো’আ-মুনাজাত, উন্নত চরিত্র, ইস্‌তিক্বামাত এবং তাক্বওয়ার ন্যায় গুণাবলিতে ‘সালেহীন’ (সৎকর্মশীলগণ)’র ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়।

ব্যক্তি জীবনের উপর প্রশংসনীয় গুণাবলির প্রভাব

উল্লেখিত গুণাবলির ধারক ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিত্বের উপর এসব গুণাবলির প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এবং তাঁদের এ গুণাবলির কারণে সমাজের বসবাসকারীরাও ‘ফয়যপ্রাপ্ত’ (কল্যাণধারার অধিকারী) হন। সুতরাং মানবজাতির পথপ্রদর্শন ও হিদায়তের জন্য তাঁদের ভূমিকা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। নিচে সালেহীন’র জীবন-চরিত ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবসমূহ বর্ণনা করা হচ্ছে:

০১.ইন্দ্রিয় শক্তি বৃদ্ধি

আউলিয়া ও সালেহীন ইবাদত, রিয়াযত, তাক্বওয়া ও পরহেযগারীর কারণে এ মর্তবা ও পর্যায়ে পৌঁছে যান যে, তাঁদের ইন্দ্রিয়সমূহের শক্তি বৃদ্ধি পায়। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হাদীস-ই ক্বুদসীতে আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন, যেসব বস্তুর মাধ্যমে বান্দা আমার নিকটবর্তী হয়, সেগুলোর মধ্যে আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় বস্তু হচ্ছে, ফরযসমূহ এবং আমার বান্দা নফলসমূহের মাধ্যমে আমার প্রতি সর্বদা নৈকট্য হাসিল করতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাকে আমার প্রিয় বানিয়ে নেই। তারপর ইরশাদ করেন:

فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا

‘সুতরাং যখন আমি তাকে নিজের প্রিয় বানিয়ে নেই, তখন তার কান হয়ে যাই, যেটা দ্বারা সে শ্রবণ করে; তার চোখ হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে; তার হাত হয়ে যাই, যেটা

---

[২৮] আল্ ক্বোরআন, সূরা (১০) ইয়ূনুস, আয়াত: ৬২-৬৪

[২৯] ফুতূহুল গায়ব: ৪০

দ্বারা সে ধরে এবং আমি তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে পথচলে।”[৩০]

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি এ হাদীস-ই কুদসী’র বিষয়ে স্পষ্ট করে বলেন: যখন আল্লাহ তা‘আলার মহত্বের নূর তার শ্রবণ হয়ে যায়, তখন তিনি দূরে-কাছের সকল আওয়াজ শুনতে পান; যখন এ নূর তার দৃষ্টি হয়ে যায়, তখন তিনি দূরে-কাছের সব বস্তু দেখতে পান; আর যখন এ মহত্বের নূর তার হাত হয়ে যায়, তখন এ বান্দা কঠিন ও সহজ, দূরে-কাছের সব বস্তুতে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন।[৩১]

আল্লাহ তা‘আলা তাক্বওয়াবানদেরকে বিশেষ বুঝ শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি দান করেন। ক্বোরআনুল হাকীমে এসেছে:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا.

‘হে ঈমানদারগণ! যদি আল্লাহ্কে ভয় করো তবে তোমাদেরকে তা-ই প্রদান করা হবে, যা দ্বারা সত্যকে মিথ্যা থেকে পৃথক করে নেবে।’[৩২] হাদীস শরীফে মু’মিনের ‘ফিরাসাত’ (অন্তর্দৃষ্টি) সম্পর্কে এভাবে এসেছে-

اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ، ‘তোমরা মু’মিনের ‘ফিরাসাত’ (অন্তর্দৃষ্টি) থেকে ভয় করো, কেননা সে আল্লাহ্র নূর দ্বারা দেখে।’[৩৩] পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে জানা গেছে যে, সালেহীন’র কান, চোখ, হাত এবং পায়ের শক্তি বৃদ্ধি পায়। অনুরূপ তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি বৃদ্ধি পায়। এর কারণ হচ্ছে, তাঁদের হক্ব ও বাতিল-এর মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি এবং অপর বিষয়াদিতে সিদ্ধান্ত গ্রহনের দূরদৃষ্টি অর্জিত হয়।

০২. মুস্তাজাবুদ্ দা’ওয়াত (দো‘আসমূহ গৃহিত হওয়া)

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নেক বান্দাদেরকে এ মর্যাদা দান করেছেন যে, তারা যে দো‘আ-ই করুক, কবূল করা হয়। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়া আ-লিহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ

‘নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র বান্দাগণের মধ্যে এমন কিছু বান্দা রয়েছেন, যদি তারা আল্লাহ্র শপথ করে কোন কথা বলেন, তবে আল্লাহ সেটাকে অবশ্যই পূরণ করেন।’[৩৪]

হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু’র বর্ণনার শব্দাবলি নিম্নরূপ:

رُبَّ أَشْعَثَ، مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ

‘এলোমেলো চুল বিশিষ্ট বহু লোক এমন রয়েছে, যাদেরকে দরজাগুলো থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়; যদি তারা আল্লাহ্র শপথ করে কোন কথা বলে, আল্লাহ্ তা‘আলা সেটাকে সত্যে পরিণত করেন।’[৩৫] অর্থাৎ এমন লোকও রয়েছে, যার বাহ্যিক অবস্থা দেখে তাকে দরজাগুলো থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া হয়, কিন্তু আল্লাহ তা‘আলার দরবারে তার মর্তবা ও মর্যাদা এ উঁচু হয় যে, যদি সে আল্লাহ তা‘আলার শপথ করে কোন কথা বলে, তখন আল্লাহ তা‘আলা তার কথার সম্মান রক্ষায় সেটাকে অবশ্যই পূরণ করেন। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস-ই কুদসী’র শেষাংশে এ শব্দাবলি রয়েছে:

وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ ‘যদি সে আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করে, তবে আমি তাকে অবশ্যই দান করি এবং যদি আমার নিকট আশ্রয় চায়, তখন আমি তাকে অবশ্যই রক্ষা করি।’[৩৬]

হুযূর গাউসুল আ’যম শায়খ আবদুল ক্বাদের জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু আল্লাহ তা‘আলার ‘যাত’ (সত্ত্বা) সম্পর্কে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, “হে আদম সন্তান! আমি আল্লাহ! আমি ছাড়া কোন মা’বূদ নেই। আমি যে বস্তুকে হুকুম করি ‘হয়ে যাও’, সেটা নিশ্চিত হয়ে যায়। অতঃপর তুমি আমার আনুগত্য করো। তাহলে আমি তোমাকেও অনুরূপ বানিয়ে দেব যে, তুমি যে বস্তুকে হুকুম দিবে ‘হয়ে যাও’, সেটা হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্র অনুমতিতে অস্তিত্বে এসে যাবে। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নবীগণ, সিদ্দীক্বগণ, আউলিয়া ও বিশেষ বিশেষ আদম সন্তানদেরকে এমনই রূহানী শক্তির ধারক বানান।”[৩৭]

---

[৩০] বোখারী, আস্ সহীহ্, কিতাবুর রিক্বাক্ব, খন্ড-৮, পৃ. ১০৫, হা/৬৫০২

[৩১] তাফসীরে কাবীর, সূরা ইয়ূনুস, ৬৪ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য

[৩২] আল্ ক্বোরআন, সূরা (৮) আল্ আন্ফাল, আয়াত: ২৯

[৩৩] সুনানে তিরমিযী,আবওয়াবুত তাফসীর, খন্ড-৫, পৃ. ১৪৯, হা/ ৩১২৭

[৩৪] বোখারী, আস্ সহীহ্, কিতাবুস সুল্হ, খন্ড-৩, পৃ. ১৮৬, হা/ ২৭০৩

[৩৫] মুসলিম, আস্ সহীহ্, কিতাবুল বির্, খন্ড-৪, পৃ. ২০২৪, হা/ ২৬২২

[৩৬] বোখারী, আস্ সহীহ্, কিতাবুর রিক্বাক্ব, খন্ড-৮, পৃ. ১০৫, হা/৬৫০২

[৩৭] ফুতূহুল গায়ব: ৩৬

সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদেরকে ‘ كُنْ فَيَكُونُ ’ (হয়ে যাও! তা সাথে সাথে হয়ে যায়)’র ‘ফয়য’ (কল্যাণধারা) দান করেন। তাঁর বান্দাগণ যখন কোন বস্তুর সম্পর্কে বলেন, ‘হয়ে যাও!’, তখন সেটা আল্লাহ্‌র হুকুমে হয়ে যায়। এ আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, আউলিয়া ও সালেহীন’র দো‘আসমূহকে আল্লাহ্ তা‘আলা কবূলের মর্যাদা দান করেন। এটা যেন তাঁরা ‘মুস্‌তাজাবুদ্ দা‘ওয়াত’র মর্তবা হাসিল করেন।

০৩. সোহবতের ফয়য (কল্যাণধারা)

আউলিয়া ও সালেহীন’র ব্যক্তিত্ব এ পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করে যে, তাঁদের নিকট উপবেশনকারী ব্যক্তিগণ বহু রূহানী নি’মাত দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে যান। অনুরূপ তাঁদের সোহবত বা সান্নিধ্যে বসে হতভাগারাও নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান করে নেয়। এ কারণে যে, আল্লাহ তা‘আলা সিদ্দীক্বগণের সান্নিধ্য হাসিলের নির্দেশ দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ
‘হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।’[৩৮]

হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণিত বর্ণনায় আউলিয়া ও সালেহীন’র সংস্পর্শে থাকা ব্যক্তিবর্গের অর্জিত ফয়য সম্পর্কে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, هُمُ الْجُلَسَاءُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ ‘তাঁরা হচ্ছেন এমন ব্যক্তিবর্গ, যাঁদের সংস্পর্শে বসা লোকেরা দুর্ভাগা থাকে না।’[৩৯] এ হাদীস শরীফে সালেহীন’র সোহবত’র ‘ফুয়ূযাত’ (কল্যাণধারা)-এর বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁদের সান্বিধ্যে বসা লোকেরা দুর্ভাগা থাকে না এবং তাদের যেসব আমল কবূলের উপযুক্ত ছিল না, কবূল করা হয়। অপর এক হাদীস শরীফে এসেছে: ‘ الجليس الصالح’ নেককার বন্ধুর সোহবত’র ফয়যকে সুগন্ধি ও আতর ব্যবসায়ীর উপমা দিয়ে বুঝানো হয়েছে। যেমনিভাবে সুগন্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকটে বসলে, তার নিকট থেকে সুগন্ধি না কিনলেও তার সুগন্ধি থেকে উপকৃত হয়; কিন্তু এক্ষেত্রে সুগন্ধি অস্থায়ী হয় আর তার নিকট থেকে ক্রয় করলে স্থায়ীভাবে সুগন্ধি দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ হয়। অনুরূপ সালেহীন’র সোহবতে বসা ব্যক্তিবর্গ যদি তাঁদের অনুসরণ করে নেক আমল করা শুরু করে দেয় এবং মন্দ আমলসমূহ পরিহার করে, তাহলে তারা স্থায়ীভাবে সোহবতের ‘ফয়য’ (কল্যাণধারা) হাসিলকারী হয়ে যেতে পারবে এবং যদি কোন ব্যক্তি ওই ফয়য থেকে উপকার হাসিল করতে না পারে, তাহলে সে সালেহীন’র সোহবত’র সময়গুলোতে মন্দকর্মসমূহ সম্পাদন করা থেকে সুরক্ষিত থাকবে এবং তার সংশোধনী কথাবার্তা শোনার সুযোগও অর্জিত হবে। সুতরাং সালেহীন’র সোহবত দ্বারা অস্থায়ী ও সাময়িক উপকার অর্জন করতে করতে আশা করা যায় যে, সেটি স্থায়ী ফয়য-এ রুপান্তরিত হবে।

০৪. কাশ্‌ফ ও কারামত প্রকাশ হওয়া

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বিশেষ বান্দাগণকে রহস্যাদি ও অদৃশ্য ইল্‌মসমূহ দ্বারা পুরষ্কৃত করেন। তেমনিভাবে স্বভাব বহির্ভূত ঘটনাবলিও প্রকাশ করার শক্তি ও সামর্থ দান করেন। যা প্রচলিত অর্থে, ‘কারামত’ দ্বারা বিবেচনা করা হয়। আউলিয়া-উল্লাহ্’র কারামত প্রকাশ হওয়া ‘হক্ব’ (সত্য)। আক্বাইদ’র কিতাবসমূহে রয়েছে:

كرامات الاولياء حق. ‘ওলীগণের কারামতসমূহ ‘হক্ব’ (সত্য)।’[৪০] ওলীগণের কারামত কিতাব, সুন্নাহ্ সাহাবা-ই কিরামের বর্ণনা ও ইজমা’ দ্বারা প্রমাণিত। সুফীগণের কারামাত’র উপর ওলামা-ই দ্বীন স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন। শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু কাশ্‌ফ ও কারামাত’র প্রকাশের কারণ হিসেবে কুপ্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে পরিহার করাকে আখ্যা দেয়ার পর বলেন: “এ সময়ে উলূম-ই লাদুন্নিয়াহ্ ও ইলাহী রহস্যাদি তোমার নিকট উন্মোচন করা হবে এবং তোমাকে কিবরিয়ায়ী হেরমের গোলাম বানানো হবে। অতঃপর এ বিলায়তের মর্তবা ও মর্যাদায় ‘তাকভীন’ তথা বিস্ময়কর ও দৃষ্টান্তহীন বস্তুসমূহকে প্রকাশে আনা এবং স্বভাব বহির্ভূত শক্তি ও সামর্থ তোমাকে দান করা হবে। এ বিলায়তের স্তরে তুমি অনুভব করবে যে, তোমাকে এক মর্মার্থপূর্ণ, আধ্যাত্মিক, বাতেনী মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার জীবিত করা হয়েছে এবং তোমার সবকিছু ইলাহী কুদরতের বিদ্যমান থাকার বিকাশস্থল হয়ে গেছে।”[৪১]

---

[৩৮] আল্ ক্বোরআন, সূরা (৯) তাওবা, আয়াত: ১১৯

[৩৯] বোখারী,আস্ সহীহ্, কিতাবুদ্ দা’ওয়াত, খন্ড-৮, পৃ. ৮৬, হা/৬৪০৮

[৪০] শরহে আক্বাইদ-ই নাসাফী, পৃ.৪৫০

[৪১] ফুতূহুল গায়ব, পৃ. ৭৩

❖ **শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানী** রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু 'কাশ্‌ফ' (রহস্য উন্মোচন)'র মাক্বসূদ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে এভাবে বয়ান করেছেন: "কিছু সময় আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কোন ওলী ও পুন্যবান বান্দাকে কিছু পাপী, গুনাহগার লোকদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিন দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবগত করেন এবং ওই কাশ্‌ফ'র উদ্দেশ্য হয় যে, ওই বুযুর্গ এসব গোমরাহ্ ও বদকার লোকদেরকে শর'ঈ বিষয়াদি রক্ষা ও সম্মানপ্রদর্শন'র শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ করবেন এবং কালামুল্লাহ্'র আলোকে হক্ব-বাতিল-এর মধ্যে পার্থক্য তাদের নিকট স্পষ্ট করবেন।" (ফুতূহুল গায়ব, পৃ. ১২৫)

প্রকৃতপক্ষে কাশ্‌ফ ও কারামত-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, জনসাধারণকে পথপ্রদর্শনের প্রতি ধাবিত করা। কাশ্‌ফ প্রকাশ আউলিয়ার সত্ত্বার সাথে সম্পর্কিত, কিন্তু কারামত'র পরিধি আরো বিস্তৃত হয়। যার ব্যাপারে কাশ্‌ফ হয়, তাকে অবগত করলে সেটা জানা যায়, কিন্তু কারামত প্রকাশ হলে সেসময় উপস্থিত লোকেরা নয় শুধু স্বয়ং নিজেও দেখতে পান, বরং সেটার সাক্ষী ও প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে যান। আমাদের সমাজে লোকেরা কারামতকেই বিলায়তের মানদন্ড হিসেবে মনে করে। অথচ বিষয়টি এমন নয়। কারামত বিলায়তের একটি আলামত ও স্তর। **খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া** রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন: "কিছু মাশাইখ 'সুলূক' (আধ্যাত্মিকতা অর্জনের পথ)'র ১০০ টি স্তর নির্ধারণ করেছেন এবং তন্মধ্য থেকে ১৭ টি স্তর হচ্ছে কাশ্‌ফ ও কারামত-এর। অনুরূপ কাশ্‌ফ ও কারামাতকে 'হিজাব-ই রা-হ' (আধ্যাত্মিকতা অর্জনের পথের পর্দা) আখ্যা দেয়া হয়।" (সিয়ারুল আউলিয়া, পৃ. ৩১১, ২৬২) এতদ্বসত্ত্বেও আউলিয়া-ই কিরাম নিজেদের গোপন করেন, কারামাত নিয়ে অহংকার বা গর্ব করেন না। বিনয়-ই তাঁদের ভূষণ।

০৫. সত্য স্বপ্ন ও সুসংবাদ প্রদান

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নেককার বান্দাদেরকে পথপ্রদর্শন করার জন্য উত্তম স্বপ্ন দ্বারা পুরস্কৃত করেন। সূরা ইয়ূনুস-এর ৬৪ নম্বর আয়াত ' لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا'(তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনে)-এর তাফসীরে এসেছে, هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَوْ تُرَى لَهُ. 'এটি হচ্ছে, উত্তম স্বপ্ন যা নেককার ব্যক্তি দেখে থাকেন, যদিওবা সেটা সম্পর্কে অপর কেউ দেখে।'(মুয়াত্তা, কিতাবুর রু'ইয়া, খন্ড-৫, পৃ. ১৩৩৫, হাদিস নং- ৩৫১৬)

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:

الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ، جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ.

'নেককার ও সালেহ ব্যক্তির উত্তম স্বপ্ন নুবূয়তের ছেচল্লিশ অংশের এক অংশ।'

(মুয়াত্তা, কিতাবুর রু'ইয়া, খন্ড-৫, পৃ. ১৩৯৩, হা/ ৭৬৪/৩৫১১)

এ বর্ণনাগুলো দ্বারা বুঝা যায় যে, আত্মশুদ্ধি অবলম্বনকারী সালেহীন ও ওলীগণকে নুবূয়তের ফয়য থেকে এ অংশ দান করা হয়েছে, তথা উত্তম স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁদের আত্মার প্রশান্তি ও দিকনির্দেশনা অর্জিত হয়।

০৬. ইসলাম প্রচার

সালেহীন ও ওলীগণের ব্যক্তিত্বের প্রভাবগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, তাঁদের শিক্ষাসমূহ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অসংখ্য লোকের আমলসমূহ ও ব্যক্তিত্বের সংশোধন হয় এবং দ্বীন-ই ইসলাম'র সাহায্য-সহযোগিতা হয়। সুফীগণের তাবলীগ তথা ইসলাম প্রচারে প্রভাব বিস্তারের মূল কারণ হচ্ছে, তাবলীগের মূলনীতির উপর পরিপূর্ণ আমল করা। সুফীগণ ও ওলীগণের কথা ও কাজে মিল ও একই রকম হওয়া, উত্তম চরিত্র, তরবিয়ত-প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, নরম কথাবার্তা, ভদ্রতা, দূরদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি, হিকমত ও প্রজ্ঞার কারণে লোকেরা ইসলাম কবূল করেছেন। পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, সালেহীন'র ব্যক্তিত্ব দ্বারা ইন্দ্রিয় শক্তি বৃদ্ধি, মুস্তাজাবুদ্ দা'ওয়াত, সোহবতের ফয়য, কাশ্‌ফ ও কারামত প্রকাশ, উত্তম স্বপ্ন এবং ইসলামের প্রচার-এর ন্যায় প্রভাবসমূহ বিস্তার লাভ করে। আমাদের সমাজের সংশোধন, রূহানী মর্যাদা অর্জন এবং ইসলামী শিক্ষাগুলোকে প্রচার-প্রসারে সালেহীন'র ভূমিকাকে অস্বীকার করা যাবে না এবং এ ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলির ধারকদেরকেই সালেহীন'র দলভূক্ত বলে গণ্য করা হয়।

আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা, তিনি আমাদেরকে প্রকৃত সালেহীন'র সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাঁদের সংস্পর্শ ও সান্নিধ্য গ্রহণ করার তাওফীক্ব দান করুন, যাতে আমরা আমাদের রূহানী মূল্যবোধগুলোকে ভাল করতে পারি এবং ইসলামের প্রকৃত আদর্শ মোতাবেক আমল করে জীবন কাটাতে পারি। আমীন! বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালীন। সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আ-লিহি ওয়াসাল্লাম।

লেখক: কলাচরপি-আনজুমান রিসার্চ সেন্টার, চট্টগ্রাম।

অফুরন্ত কল্যাণ ও বরকতের আধার পবিত্র কা'বা ঘর

মাওলানা মুহাম্মদ মুনিরুল হাছান

মহামহিম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ঘোষণা অনুসারে পবিত্র কা'বা ঘর হলো পৃথিবীর সর্বপ্রথম ঘর এবং মানব জাতির জন্য হেদায়তের পথ প্রদর্শক। এই পবিত্র ঘরটি বিশ্ব মুসলিমের সম্মেলনস্থল এবং সারা বিশ্বের স্থিতিস্থাপক। মানব সৃষ্টির বহুপূর্বে আল্লাহ তায়ালা কা'বাঘর সৃষ্টি করেছেন। ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা যায়, যখন পৃথিবীর বুকে কোনো মানুষ ছিলনা তখন আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতারা কা'বাঘর নিমার্ণ করে আল্লাহর ইবাদত করেন। পরবর্তীতে আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির জন্য এই ঘরটি নির্মাণ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "নিশ্চয় সর্বপ্রথম গৃহ, যা মানব মন্ডলির জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা ঐ ঘর যা বাক্কায় (মক্কায় অপর নাম) অবস্থিত, ঐটি সৌভাগ্যযুক্ত এবং সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য পথপ্রদর্শক। [সূরা আলে ইমরান-৯৬]

নামকরণ

"কা'বাতুন" আরবি শব্দ। কা'বা শব্দের অর্থ হলো চতুষ্কোন বিশিষ্ট ঘর। কা'বা ঘরটি পবিত্র মক্কা নগরীতে মসজিদুল হারামের মধ্যখানে অবস্থিত। এই ঘরের পূর্বকোনায় রয়েছে পবিত্র হাজরে আসওয়াদ, এজন্য এই কোনাকে রুকনে আল আসওয়াদ বলা হয়। অনুরূপ উত্তর কোনা হলো "রুকনে ইরাকী" পশ্চিমের কোনাকে রুকনে শামী আর দক্ষিণের কোনাকে "রুকনে ইয়ামানী" বলা হয়। পবিত্র মক্কানগরীর অনেকগুলো নাম রয়েছে। যেমন বাক্কা, বালাদুল আমীন, উম্মুল কুরা, মা'মুন, মুকাদ্দাস, বাইতুল আতীক ইত্যাদি। ইমাম ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, এটি এমন একটি নগরী যেখানে আসলে সকল স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারীর দম্ভ - অহংকার চূর্ণ হয়ে যায়। যারা এটিকে ভাঙ্গতে আসে তারা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যায় এবং লাঞ্ছিত হয়ে পিঁছু হঠতে বাধ্য হয়। ইয়ামেনের বাদশা আবরাহা বিশাল হস্তি বাহিনী নিয়ে পবিত্র কা'বাঘর কে ধ্বংস করতে এসে নিজেই ধ্বংস হয়ে যায়।

পৃথিবীর সর্বপ্রথম ঘর

পবিত্র কা'বা ঘরই হলো পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ইবাদতের জন্য নির্মিত ঘর। আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টির পূর্বে ফেরেশতা ও জীন জাতিকে সৃষ্টি করেন। ফেরেশতাগণ আল্লাহর কাছে একটি নির্দিষ্ট ইবাদত খানার জন্য আবেদন করলেন। আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের কা'বা রূপে সপ্তম আকাশে "বায়তুল মামুর" নিমার্ণ করেন। প্রথম সৃষ্টি মানুষ হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম বায়তুল মামুরে ইবাদত করতেন। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম কে পৃথিবীতে পাঠানো হলে তিনি আল্লাহর কাছে আসমানের বায়তুল মামুর এর ন্যায় জমিনেও একটি ঘরের আবেদন করেন। আল্লাহ তায়ালা তার আবেদন কবুল করেন এবং ফেরেশতাদেরকে বায়তুল মামুরের আকৃতি নিয়ে পৃথিবীতে পাঠান। সুতরাং কা'বাঘরই হলো পৃথিবীর সর্বপ্রথম গৃহ বা ঘর। এর পূর্বে পৃথিবীতে কোনো ঘর নির্মিত হয়নি। হযরত আবু যর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পৃথিবীর সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটি? তিনি বলেন, মসজিদুল হারাম। আমি বললাম, এর পর কোনটি? তিনি বলেন, মসজিদুল আকসা। আমি আবার বললাম, এই দুটি মসজিদ নির্মাণের ব্যবধান কত? তিনি বললেন চল্লিশ বছর। [সহীহ মুসলিম]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহর আরশ পানির উপর ছিল। ইমাম বগভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, জগত সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তায়ালা এক ঘূর্ণিঝড় প্রেরণ করলে এ পানিকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দেয়। এতে বর্তমান কা'বা ঘর যেখানে রয়েছে সেখানে গুম্বুজের মতো ফেনার সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তায়ালা মাটি ও পর্বতমালা সৃষ্টি করে একে স্থিতি দান করেন। পৃথিবীর স্থিতিদানকারী সর্বপ্রথম পাহাড়টি হলো আবু কুবাইস নামক পাহাড়। যা কা'বা ঘরের অতি নিকটেই অবস্থিত।

কা'বা ঘর নির্মাণ

ইবনে জারীর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম কে ওহী পাঠালেন যে, আমার আরশ বরাবর নিচে একটি সম্মানিত স্থান রয়েছে। তুমি সেখানে আমার সন্তষ্টি অর্জনের জন্য একটি ঘর নির্মাণ কর এবং আমার আরশের চতুর্পাশে তাওয়াফকারী ফেরেশতাদের ন্যায় তুমিও এর তাওয়াফ কর। সেখানে আমি তোমার এবং তোমার সন্তানদের সকল দোয়া কবুল করব। আদম আলায়হিস্ সালাম বললেন, স্থানটাতো আমি চিনিনা। তখন আল্লাহ তায়ালা একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে স্থানটি চিহ্নিত করে দেন। ফেরেশতাদের সহযোগিতায় আদম আলায়হিস্ সালাম পাঁচটি পাহাড়ের পাথর দিয়ে পবিত্র কা'বাঘর নিমার্ণ করেন। পাহাড়গুলো হলো ১। সিনাই পাহাড়, ২। যাইতুন পাহাড়, ৩। লুবনান পাহাড়, ৪। জূদী পাহাড়, ৫। হেরা পাহাড়। কা'বাঘর নির্মাণ শেষে হযরত জিবরাঈল আলায়হিস্ সালাম হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম কে হজের নিয়মকানুন শিক্ষা দেন। আদম আলায়হিস্ সালাম এর পুত্র হযরত শীস আলায়হিস্ সালাম এটিকে মেরামত করেন। হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম এর সময় মহাপ্লাবনে এটি ধ্বংস হয়ে গেলে আমালিকা গোত্রের লোকেরা এটিকে পুনঃ নির্মাণ করেন।

হযরত ইবরাহীম ও ইসমাইল আলায়হিস্ সালাম কর্তৃক পূণঃ নির্মাণ

হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম কর্তৃক নির্মিত এই কা'বা ঘর হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম এর সময়ে মহাপ্লাবন পর্যন্ত অক্ষত ছিল এবং ঐ সময়ের মহাপ্লাবনে এটি বিধ্বস্ত হয়। অতঃপর হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাইল আলায়হিস্ সালাম আল্লাহর নির্দেশে কা'বা ঘর পুনঃ নির্মাণ করেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাইল কাবাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল। তারা দোয়া করছিল, পরওয়ারদেগার! আমাদের থেকে কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। [সূরা বাকারা- ১২৭]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, যখন আমি ইবরাহীমের জন্য এ গৃহের স্থান ঠিক করে দিলাম। [সূরা হজ-২৬]

স্মর্তব্য বিষয় হলো এই কাবা ঘরের স্থান পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিল। নির্মাণের সময় হযরত ইসমাইল আলায়হিস্ সালাম পাথর নিয়ে আসতেন আর ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম তা গাথুঁনি করতেন। গাথুঁনি যখন উপরে উঠল এক পর্যায়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে লিফটের মত ব্যবস্থা হলো আরেক কুদরতি নিদর্শন "মাকামে ইবরাহীম" এর মাধ্যমে। এই মাকামে ইবরাহীম কা'বা ঘরের পাশে এখনো সংরক্ষিত রয়েছে। এই পাথরটি হযরত ইবরাহিম আলায়হিস্ সালাম এর প্রয়োজন অনুসারে সামনে পেছনে উপরে নিচে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উঠানামা করতো। আল্লাহ তায়ালা বলেন, এতে রয়েছে মাকামে ইবরাহীমের মতো প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আর যে এর ভেতরে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে। [সূরা আলে ইমরান-১৯৭]

কা'বা শরীফের মর্যাদা

পবিত্র কা'বাঘর পৃথিবীর সকল মসজিদের প্রাণকেন্দ্র। এর রয়েছে অসাধারণ সম্মোহনী শক্তি। এর ভিত্তি হয়েছিল শিরকমুক্ত একত্ববাদের উপর ইখলাস ও একনিষ্ঠতার উপকরণ দিয়ে। সেই আদিকাল থেকে এই ঘরটির মর্যাদা এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, এখানে আপনজন হত্যাকারীকে পেলেও তাকে হত্যা করা হতোনা। অপবিত্র অবস্থায় এই ঘরে প্রবেশের কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি ইবরাহীম ও ইসমাইলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, এতেকাফ বা অবস্থানকারী ও রুকু সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখো। [সূরা বাকারা-১২৫]

হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, জাহেলিয়্যাহ যুগে কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে হত্যা করতো এবং এর পর সে তার গলায় একটুকরো উলের কাপড় পেচিয়ে কা'বাঘরে প্রবেশ করতো তাহলে মারাত্মক প্রাণঘাতি পিতা বা ভ্রাতার হত্যাকারীকে পেয়েও কেউ এখানে প্রতিশোধ নিতোনা। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ঐ পবিত্র জায়গা ত্যাগ না করতো। এজন্য আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আর যে ওর মধ্যে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তা লাভ করবে। [সূরা আলে ইমরান-৯৭]

আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে বলেন, "অতএব তারা ইবাদত করুক এই গৃহের রবের, যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভয় ভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন। [সূরা কুরাইশঃ ৩-৪]

কা'বা ঘর বিশ্বশান্তি ও স্থায়িত্বের কারণ

আল্লাহ তায়ালা কা'বা ঘরকে বিশ্ববাসীর স্থিতিশীলতা ও শান্তির কারণ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা

বলেন, আল্লাহ সম্মানিত গৃহ কা'বা কে মানুষের স্থীতিশীলতার কারণ করেছেন এবং সম্মানিত মাস সমূহকে। [সূরা মায়েদা-৯৭]

হযরত আতা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, পবিত্র কা'বা বিশ্বের স্তম্ভ যতদিন এর দিকে মুখ করা হবে এবং হজ পালিত হবে, ততদিনই জগৎ প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যদি কোনো সময় খানায়ে কা'বার সম্মান বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন মহাবিশ্বকেও বিলীন করে দেওয়া হবে। সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা কা'বা শরীফের মর্যাদাকে এমনভাবে স্থাপন করে দিয়েছেন, যার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য যাবতীয় ভাবাবেগ ও প্রবৃত্তিকে বর্জন করতেও মানুষ কুণ্ঠাবোধ করেনা। যে একবার দেখে তার মনে ঐ ঘরকে পুনরায় দেখার আগ্রহ তৈরি হয়। হযরত মুজাহিদ রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, কোনো মানুষ কা'বা ঘরের যেয়ারত করে তৃপ্ত হয়না, বরং প্রতিবার যেয়ারতের পর পুনরায় যাওয়ার বাসনা নিয়ে ফিরে আসে।

বায়তুল্লাহর হজ বিশ্ব মুসলিমের মহাসম্মেলন

বিশ্বের সকল মুসলমান যে এক উম্মত হজ মৌসুমে এর বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায়। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে মুসলমানগণ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এখানে সমবেত হয়। স্মরণাতীত কাল থেকে মুসলমানদের সবচাইতে বড় সমাবেশ হলো হজ। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম কর্তৃক কা'বা ঘর নির্মিত হলে আল্লাহ তায়ালা আদেশ দেন "বিশ্ববাসীকে এই ঘর তাওয়াফের জন্য আহবান জানাও"। তিনি আরজ করলেন, হে প্রভূ! এতো জনবানবহীন প্রান্তর। আমার আহবান জগদ্বাসী কীভাবে শুনবে? আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমার দায়িত্ব কেবল ঘোষণা দেয়া আর মানুষের কানে পৌছানো আমার কাজ। অতঃপর তিনি মাকামে ইবরাহীমের উপর দাঁড়িয়ে বা আবু কুবাইস পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন- ওহে লোকজন তোমাদের পালনকর্তা নিজ গৃহ নির্মাণ করে তার জিয়ারত তোমাদের উপর ফরজ করে দিয়েছেন সুতরাং তোমরা এই ঘর প্রদক্ষিণ কর। পয়গাম্বরের এ আহবান আল্লাহ তায়ালা বিশ্বের সকল কোনে পৌছিয়ে দেন। যারা এই আহবানে সাঁড়া দিয়ে লাব্বাইক বলেছে তারা এ ঘরের জেয়ারত লাভে ধন্য হবে।

বায়তুল্লাহ শরীফে সালাত আদায়ের ফযিলত

পবিত্র কা'বার চর্তুদিকে বিস্তৃত মসজিদকে বলা হয় মসজিদুল হারাম। এখানে এমন একটি ইবাদত করা হয় যা পৃথিবীর আর কোথাও হয়না। সেটি হলো "তাওয়াফ"। রাসূলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন কা'বা গৃহের উপর প্রতিদিন ১২০টি রহমত নাযিল হয়। তাওয়াফ কারীদের জন্য ৬০টি, নামাজ আদায় কারীদের জন্য ৪০টি এবং যারা কা'বা ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকে তাদের জন্য ২০টি রহমত বরাদ্দ থাকে। [বায়হাকী]

সুতরাং পবিত্র কা'বা ঘরের দিকে তাকানোও ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত। অন্য হাদীসে রাসূল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, কোনো বান্দাহ যদি নিষ্ঠার সাথে মর্যাদাবান এই ঘরে এক রাকাত নামাজ আদায় করে তাকে আল্লাহ তায়ালা এক লাখ রাকাত নামাজের সমান সাওয়াব দান করবেন। [মুসনাদে আহমদ]

অপর হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি যথাযথভাবে সাতবার বায়তুল্লাহ তথা কা'বা ঘর তাওয়াফ করে এবং দুই রাকাত সালাত আদায় করে, তার একটি গোলাম আযাদ করার সাওয়াব হয়। আল্লাহ তায়ালা তাওয়াফের প্রতি কদমে একটি করে গুনাহ মাফ করেন, একটি নেকি দান করেন এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। [তিরমিযী- ৯৫৯]

মুমিন হৃদয়ের তীর্থ পবিত্র কা'বা

মুমিনগণ পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থাকুক না কেন প্রতিদিন পাঁচ বার ঐ কা'বা দিকে মুখ করে সালাতে দাঁড়ায়। প্রতিটি মুসলমান আল্লাহর কাছে নতশিরে দোয়া করেন জীবনে একবার হলেও যেন কা'বা ঘরকে নিজের চোখে দেখে। কা'বা ঘরের চর্তুদিকে আল্লাহর বান্দাগণের তাওয়াফের দৃশ্য প্রতিটি মুমিনের নয়ন জুড়িয়ে তাদের মনে আবেগের স্পর্শ তৈরি করে। এজন্য আল্লাহ তায়ালা বলেন "আল্লাহরই জন্য মানবকুলের উপর সেই ঘরের হজ করা (ফরজ) যে সেটা পর্যন্ত যেতে পারে। আর যে অস্বীকারকারী হয় তবে আল্লাহ সমগ্র জাহান থেকে বেপরোয়া"। [সূরা আলে ইমরান-৯৮]

হযরত ইবরাহীম ও ইসমাইল আলায়হিস্ সালাম এর স্মৃতি বিজড়িত কা'বা

এককালের জনমানবহীন বিরান পাহাড়ী উপত্যকা কে আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম এর দোয়ার বরকতে সমগ্র পৃথিবীবাসির জন্য সংযোগ স্থল করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, যখন ইবরাহীম বলল, পরওয়ারদেগার! এ স্থানকে তুমি শান্তির নগরীতে পরিণত কর এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও কিয়ামতে বিশ্বাস করে, তাদেরকে ফলের দ্বারা রিজিক দান কর।

বললেন, যারা অবিশ্বাস করে, আমি তাদেরকে কিছুদিন ফায়দা ভোগ করার সুযোগ দেবো। অতঃপর তাদেরকে বলপ্রয়োগ দোজখের আযাবে ঠেলে দেবো। সেটা নিকৃষ্ট বাসস্থান। [সূরা বাকারা-১২৬]

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম এর দোয়া ছিল সুদূর প্রসারী ফলদায়ক। সেই যুগ থেকে এই নগরটি নিরাপদ ও কল্যাণময়।

হাজরে আসওয়াদ স্থাপন

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম যখন বর্তমানে হাজরে আসওয়াদ সেখানে রয়েছে যেখানে নির্মাণ শেষ করলেন তখন তিনি হযরত ইসমাইল আলায়হিস্ সালাম কে বললেন, এখানে এমন একটি পাথর স্থাপন কর যা তাওয়াফকারীদের অন্তরে নাড়া দেয়। এমন সময় আল্লাহর নির্দেশে পার্শ্ববর্তী আবু কুবাইস পাহাড় থেকে আওয়াজ আসলো, হে ইসমাইল! আমার কাছে একটি গচ্ছিত সম্পদ রয়েছে যা হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম জান্নাত থেকে এনেছিলেন। এবং তিনিই এই পাথরটি কে কা‘বার দেওয়ালে স্থাপন করেছিলেন। মধ্যখানে হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম এর সময়ে মহাপ্লাবনে কা‘বা ঘর ভেঙ্গে গেলে আমি পাহাড়ের ভেতর এটিকে লুকিয়ে রেখেছিলাম। অতঃপর এটিকে আপন জায়গার স্থাপন করা হলো। নবিজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, হাজরে আসওয়াদ একটি জান্নাতি পাথর। তার রং দুধের চাইতেও সাদা ছিল। অতঃপর আদম সন্তানের পাপরাশি এটিকে কালো বানিয়ে দিয়েছে। [তিরমিযী- ৮৭৭]

লেখক: সহকারি শিক্ষক (ইসলাম শিক্ষা), চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, চট্টগ্রাম।

প্রশ্নোত্তর

দ্বীন ও শরীয়ত বিষয়ক বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব

উত্তর দিচ্ছেন: অধ্যক্ষ মুফ্‌তি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান

মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ্
সিতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে কুরবানীর মাংস বন্টনের নিয়ম রয়েছে কিনা? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর: কুরবানী অত্যন্ত সওয়াব, মঙ্গলময় ও পূণ্যময় একটি ইবাদত। যা হানাফী মাযহাব অনুযায়ী সামর্থ্যবান মুসলমানদের উপর ওয়াজিব। শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রেজামন্দি লাভ করাই হলো কুরবানির উদ্দেশ্য। এ কারণে কুরবানী রিয়া তথা লোক দেখানো হতে মুক্ত ও পবিত্র হতে হবে। কুরবানীর পশুর গোশত বন্টনের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি বা বিধান রয়েছে। ফিক্বহ্-ফতোয়ার গ্রন্থসমূহে উল্লেখ রয়েছে কুরবানি পশুর গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ গরীব-মিসকিনের জন্য, একভাগ নিজের আত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং এক ভাগ স্বীয় পরিবারের জন্য বন্টন করা মুস্তাহাব। অবশ্য কুরবানীর পশুর গোশত পুরোটাই গরীব-মিসকিন অথবা নিকটাত্মীয়দের মাঝে বন্টন করে দেওয়া জায়েজ ও বৈধ। তবে কেউ ইচ্ছা করলে নিজের পরিবার-পরিজনের জন্যেও পুরোটা রেখে দিতে পারবে। তবে নিয়ত হতে হবে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী করা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। গোশত খাওয়া নয়। গোশত খাওয়ার নিয়তে কুরবানী করলে তা কখনো আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুল হবে না। কেননা এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا
وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

তরজমা: আল্লাহর নিকট পৌঁছে না (কুরবানী পশুর) এর গোশত ও রক্ত; তাঁর নিকট পৌঁছে কেবল তোমাদের (কুরবানীদাতা) তাকওয়া। অর্থাৎ তাকওয়া ও বিশুদ্ধ নিয়তের দরুন কুরবানি আল্লাহর দরবারে কবুল হয়। অন্যথায় কবুল হয় না। [সূরা হজ্জ, আয়াত-৩৭]

অপর আয়াতে উল্লেখ রয়েছে-

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

তরজমা: নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা (ইবাদত-বন্দেগী ও নেক আমলসমূহ) কবুল করেন মুত্তাকী বান্দাগণ হতে। [সূরা মায়েদা, আয়াত-২৭]

অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের কুরবানি কবুল করেন, যারা মুত্তাকী। সুতরাং গোশত খাওয়ার নিয়তে কুরবানি কবলে শুদ্ধ হবে না। অবশ্য অছিয়ত বা মান্নতের কুরবানী আদায় করা হলে তখন সমস্ত গোশত গরীব-মিসকিনদের প্রতি সদকা করা ওয়াজিব। অছিয়ত ও মান্নতের কুরবানি হতে সামান্য অংশও নিজ ও পরিবারের কেউ খেতে পারবে না। তা হতে সামর্থবান, আত্মীয়-স্বজনদেরকেও দিতে পারবে না।
[হিদায়া, কুরবানী অধ্যায়, ফতহুল কদির ও ফতোয়ায়ে আলমগীরি ইত্যাদি]

মুহাম্মদ আবুল হোসাইন
আল-ফালাহ্ গলি, ২নং গেইট
চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: কুরবানির পশুর চামড়া বা বিক্রয়ের টাকা প্রদানের খাতগুলো কি কি? বিস্তারিত জানতে আগ্রহী।

উত্তর: কুরবানীর পশুর চামড়ার বিক্রয়লব্ধ টাকা গরীব মিসকিনদের দান করাটা অনেক বড় পূণ্যময় ও সাওয়াবজনক। তবে ইচ্ছা করলে কুরবানী পশুর চামড়া বা তার বিক্রয়লব্ধ টাকা সুন্নি মাদরাসা/এতিমখানাসমূহের এতিম ও মিসকিন ছাত্রদের জন্য এতিমখানার মিসকিন ফান্ডেও দিতে পারবে। উল্লেখ্য যে, কুরবানী ও আকিকার পশুর চামড়া মাদরাসা, মসজিদ, রাস্তা কবরস্থান অথবা ফোরকানিয়া বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য হেবা বা দান করা বৈধ ও জায়েজ। যদি কুরবানী ও আকিকার চামড়া দ্বীনি সুন্নি মাদরাসাসমূহে পাঠাতে সক্ষম না হয় বা কষ্ট হয় তখন দ্বীনি সুন্নি মাদরাসাসমূহে দান করার নিয়্যতে চামড়া বিক্রয় করে উক্ত বিক্রয়লব্ধ টাকা মাদরাসা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দান করতে কোন অসুবিধা নেই। এছাড়াও কুরবানীর পশুর পূর্ণ চামড়া ব্যবহারের যোগ্য করে জায়নামায বা দস্তরখানা বা অন্য ব্যবহারিক সামগ্রী বানিয়ে

কোরবানীদাতা নিজে ও পরিবারের সদস্যগণ ব্যবহার করতে পারবে এবং ইচ্ছা করলে কোরবানির পশুর চামড়া আত্মীয়-স্বজন, ইমাম মোয়াজ্জিন বা যাকে ইচ্ছা-হেবা বা দান করতে পারবেন। শরিয়তের পক্ষ হতে অনুমতি আছে। এ বিষয়ে মাসিক তরজুমানের জিলহজ্ব ১৪৪০ হিজরি সংখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

[ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ফতোয়ায়ে ফয়জুর রসূল কৃত. মুফতি আল্লামা জালালুদ্দীন আহমদ আমজাদী (রহ.), ২য় খন্ড, ৪৭৩পৃ. কেফায়া-৮ম খন্ড, পৃ. ৪৩৭ইত্যাদি]

✍ **মুহাম্মদ সাইদুল আরম (রাব্বী)**

কদলপুর স্কুল এন্ড কলেজ,
রাউজান, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: গরু ও ছাগলের কয় ভাগে কুরবানি করা যায়? শরীয়তের আলোকে জানালে উপকৃত হব।

উত্তর: মহান আল্লাহর প্রতি বান্দার পক্ষ থেকে ত্যাগ ও ভালোবাসার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো কুরবানী। কুরবানী করা সামর্থবান মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব। পবিত্র কুরআনে কুরবানী করার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। পবিত্র হাদীস এবং হানাফী মাযহাবের কিতাবগুলোতে কুরবানীর কোন পশু কয়জনের নামে কুরবানি করা যায় তার সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়। সাধারণত: হালাল গৃহপালিত পশু (যেগুলো বড় আকারের যেমন, উট, গরু, মহিষ সাতজনের পক্ষে ৭ ভাগ এবং ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা দিয়ে ১জনের পক্ষে কুরবানী করা যায়। যা প্রিয়নবীর মহান আমল হতে প্রমাণিত। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত জাবের আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, প্রিয়নবী রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে আমরা হুদায়বিয়ায় ৭০টি উট নহর বা জবেহ্ করলাম এবং আমাদেরকে আদেশ দিলেন যে, আমরা যেন একটি উটের মধ্যে ৭ জন শরীক হই।

[মুসলিম শরীফ, ১ম খন্ড, ৪২৪পৃষ্ঠা, সুনানে দারমী, ১ম খন্ড, ৫৪১ পৃষ্ঠা, তাহাবী শরীফ, ২য় খন্ড, ২৪৯ পৃ.]

অপর হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে-

عن جابر رضى الله عنه قال ان النبى صلى الله
عليه وسلم قال البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة

অর্থাৎ হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, গরু ও উট দ্বারা ৭ জনের পক্ষ থেকে কুরবানি করা যায়। শরহে মাআনীল আসার কিতাবে উল্লেখ রয়েছে-

عن انس رضى الله عنه قال كان اصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم يشركن سبعة فى البدنه من
الابل وسبعة فى البدنة من البقرة

অর্থাৎ হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবীর সাহাবগণ একটি উটের মধ্যে ৭জন এবং একটি গরুর মধ্যে ৭ জন শরীক হতেন। [তাহাভী শরীফ, ২য় খন্ড, ২৫০ পৃ.]

ছোট আকারের কুরবানীর পশু তথা ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা একটিতে একজনের অধিক শরীক হওয়া জায়েয নাই। তদ্রুপ হেদায়া কুরবানি অধ্যায়ে হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে যে, গরু ও উটের ক্ষেত্রে ১টিতে ৭ জন পর্যন্ত শরীক হতে পারবে আর মহিষ গরুর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। তবে ছাগল ও দুম্বাতে একটিতে একজনের কুরবানি জায়েয ও বৈধ। উল্লেখ্য যে, কেউ যদি ইচ্ছা করে গরু, মহিষ ও উট দিয়ে শুধুমাত্র একজনের নামে বা ২/৩ জনের নামে কুরবানী করতে চায় তাও করতে পারবে। এতে অসুবিধা নেই।

[শরহে মাআনিল আসার, কুরবানীর অধ্যায়, ২য় খন্ড, ২৫০পৃ. কৃত. ইমাম আবু জাফর তাহাভী (রাদ্বি.), মুখতাসারুল কুদুরী ও হেদায়া, কুরবানী অধ্যায় ইত্যাদি]

✍ **হাফেজ মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসাইন**

চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: বিগত কয়েক বছর পূর্বে তরজুমানে পড়েছিলাম, গরু-মহিষের নাড়ি-ভূড়ি খাওয়া মাকরূহে তাহরীমী। তবে আমাদের এলাকার একজন আলেম বললেন তা খাওয়াতে দোষের কিছু নেই। প্রকৃত মাসআলা জানিয়ে ধন্য করবেন।

উত্তর: হালাল প্রাণী বা জন্তুর (গরু, মহিষ, ভহিষ, উট, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা ইত্যাদি) এমন কিছু অংশ আছে যা খাওয়া মাকরূহে তাহরীমা। তন্মধ্যে 'নাড়ি-ভূড়ি অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ বা কোন কোন জায়গায় সঠিক মাসআলা না জানার কারণে বিভ্রান্তি তৈরী হয় বা নাড়ি-ভূড়ি খেতে দেখা যায়। যা ইসলামী শরীয়ত সমর্থিত নয়। তবে না জেনে এতোদিন যারা খেয়েছে তারা জানার পর খাবে না। ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত ইমাম শাহ্ আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী হানাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ফতোয়ায়ে

রজভিয়া খন্ড-২০তম, ৩৬ পৃষ্ঠায় হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ফিক্বহ্-ফতোয়ার উদ্ধৃতি উপস্থাপনপূর্বক যবেহকৃত হালাল প্রাণীর ২২টি অঙ্গ খাওয়া মাকরূহ ও নিষিদ্ধ বলেছেন। তন্মধ্যে নাড়ি-ভূঁড়ি অন্তর্ভুক্ত। যদি কেউ বা কোন আলেম মাসআলা অবগত হওয়ার পর এমন মাকরূহ খাদ্য আহার করবে বা অন্যকে খাওয়ার উপদেশ অথবা উৎসাহ্ প্রদান করবে, অবশ্যই সে গুনাহ্গার হবে। ফতোয়ায়ে ফয়জুর রাসূলে, ফকিহে মিল্লাত মুফতি জালাল উদ্দীন আমজাদী হানাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, হালাল জন্তুর নাড়ি-ভূঁড়ি খাওয়া মাকরূহে তাহরীমা তথা হারামের কাছাকাছি। তবে আল্লামা গোলাম রসূল সাঈদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি স্বীয় সংকলিত শরহে সহীহ্ বুখারী নে'মাতুল বারী ১ম খন্ডে ও শরহে সহীহ্ মুসলিম শরীফ ৫ম খন্ডে নাড়ি-ভূড়ি তথা ওজরি ও অন্ত্র খাওয়া মাকরূহে তাহরিমা হওয়া সংক্রান্ত ইমাম আ'লা হযরতের ফতোয়ায়ে রজভিয়ার উদ্ধৃতি বর্ণনা করার পর তিনি (আল্লামা গোলাম রসূল সাইদী) কয়েকটি হাদিসের উদ্ধৃতির আলোকে নাড়ি-ভূঁড়ি, ওজরি ও অন্ত্র খাওয়া মাকরূহে তাহরিমী নয় বরং মাকরূহে তানযিহী (অপছন্দনীয়) হিসেবে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

[নেমাতুল বারী, ১ম খন্ড, ৭০৫ পৃ.]

সুতরাং ওলামায়ে কেরামের মধ্যে এ বিষয়ে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হওয়ায় বিত্তবানদের জন্য এসব ঘৃণ্য অংশগুলো না খাওয়াই অধিকতর নিরাপদ ও ইহতিয়াত। যা মাসিক তরজুমান জিলহজ্ব সংখ্যা ১৪৩৩ হিজরী ও ১৪৪১ হিজরী প্রশ্নোত্তর বিভাগে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মুহাম্মদ কুতুব উদ্দীন সাদা (রোকন)
পাইরোল, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রশ্নঃ ক্বোরআন ও হাদীসের আলোকে ইয়াওমে আরাফার ফযিলত ও করণীয় সম্পর্কে জানালে বিশেষভাবে উপকৃত হব।

উত্তরঃ আরাফা শব্দের অর্থ হলো পরিচিতি। হযরত দাহ্হাক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বেহেশত হতে হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে হিন্দুস্থানে এবং হযরত হাওয়া আলায়হিস্ সালামকে আল্লাহ তা'আলা জিদ্দায় অবতরণ করান। দীর্ঘসময় পর তারা পরস্পর পরস্পরকে খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে উভয়ে ৯ জিলহজ্ব আরাফাতের ময়দানে মিলিত হন। ইসলামের ইতিহাসে এই দিনকে আরাফার দিন বা ইওয়ামে আরাফা বলা হয়। তবে 'আরফা' নামকরণ সম্পর্কে গুনিয়াতুত্ তালেবীন' গ্রন্থে আরো বহু কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন-
اليوم الموعد وشاهدٍ ومشهودٍ অর্থাৎ শপথ! প্রতিশ্রুতি দিবসের আর সেই দিবসের, যে উপস্থিত হয় ও যাতে উপস্থিত করা হয়।

[সূরা বুরুজ, ২-৩নংম্বর আয়াত]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমামে আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর 'মুসনদে ইমাম আযম গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- اليوم الموعد দ্বারা কিয়ামতের দিন উদ্দেশ্য, الشاهد দ্বারা আরফার দিন এবং المشهود দ্বারা জুমার দিন উদ্দেশ্য।

হাদীসে পাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আরফা দিনের চেয়ে উত্তম কোন দিন নেই। এ প্রসঙ্গে হাদিসে পাকে আরো উল্লেখ রয়েছে-

عن عائشة رضى الله عنها قال النبى صلى الله عليه
وسلم ما من يومٍ اكثر من ان يعتق الله فيه عبدًا من
الغار، من يوم عرفة

অর্থাৎ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আরাফার দিবসের চেয়ে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের জন্য অন্য কোন দিন নেই।

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু কাতাদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহ্ তা'আলা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন-

قال صيام يوم عرفة احتسب على الله
ان يكفر السنة التى قبله التى بعده

অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আরফা দিবসে রোযা রাখলে আমি আশা করি আল্লাহ্ তা'আলা রোযাদারের এক বছর আগের ও এক বছর পরের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেবেন।

[লাতায়েফুল মাআরিফ, কৃত. ইবনে রজভী হাম্বলী রহ., পৃ.৪৬৩]

সহীহ্ বুখারীতে উল্লেখ রয়েছে, হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

এক ইহুদী তাকে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনাদের কুরআনে একটি আয়াত আছে, যা আপনারা তেলাওয়াত করে থাকেন। তা (সে আয়াত) যদি আমাদের ইহুদী জাতির ওপর নাযিল হতো, তবে অবশ্যই আমরা সেদিনকে ঈদ হিসেবে পালন করতাম। তিনি বললেন কোন আয়াত? সে বলল-

اليوم اكلمت لكم دينكم واتتمت عليكم نعمتي
ورضيت لكم الاسلام دينًا

অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের ওপর আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম। [সূরা মায়িদা, আয়াত-৩]

তখন আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারূক ইবনে খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, এটি যে দিনে এবং যে স্থানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর নাযিল হয়েছিল তা আমরা জানি, তিনি সেদিন আরাফার ময়দানে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তা ছিল জুমার দিন।

[সহীহ্ বুখারী শরীফ, কিতাবুল ঈমান অধ্যায়, ১ম খন্ড, ৪৫নং হাদীস।

উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, আরাফা দিনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যধিক। সে দিন হজ্বের মূল অনুষ্ঠান সে দিন আরফা ময়দানে কোন হাজীর দোয়া ফেরত হয় না। সে দিন (জিলহজ্বের নয় তারিখ) আরাফার ময়দানে উপস্থিত হাজী সাহেবান ছাড়া অন্যদের জন্য রোযা রাখা, প্রচুর পরিমাণে নফল নামায ও সাদকা খায়রাত করা অনেক ফযিলত ও পূণ্যময়।

মাওলানা মুহাম্মদ সোলাইমান
ফেনি।

প্রশ্ন: ৮ জান্নাত ও ৭ জাহান্নামের নাম জানতে চাই।

উত্তর: মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে সর্বদা দু'টি জিনিস পাশাপাশি বর্ণনা করেছেন। যেমন ভালো এর সাথে মন্দ, মুমিনের সাথে কাফির ও জান্নাতের বিপরীত জাহান্নামের কথা বর্ণনা করেছেন। নেক্কার মুমিনদের জন্য সৃষ্টি করেছেন জান্নাত আর অপর দিকে মুশরিক, কাফের ও মুনাফিকদের জন্য সৃষ্টি করেছেন শাস্তির ঠিকানা জাহান্নাম।

৮টি জান্নাতের নামসমূহঃ যথা-১. জান্নাতুল ফিরদাউস, ২. জান্নাতুল আদন, ৩. জান্নাতুল মাওয়া, ৪. দারুল মকাম, ৫. দারুস্ সালাম, ৬. দারুল কারার, ৭. দারুন নাঈম ও ৮. দারুল খুলদ।

৭ জাহান্নাম বা দোযখের নামসূহঃ ১. জাহান্নাম, ২. লাযা, ৩. হুতামাহ্, ৪. সায়ীর, ৫. সাক্বার, ৬. জাহীম ও ৭. হাবিয়াহ্।

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্
চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: আত্মশুদ্ধি কাকে বলে? একজন তরিকতপন্থীর বৈশিষ্ট্যগুলো কুরআন-হাদীসের আলোকে জানালে উপকৃত হবো।

উত্তর: আত্মশুদ্ধি হলো তাসাউফ বা তরিকতের প্রথম স্তর। আরবীতে বলা হয় তাযকিয়াতুন্ নাফ্স। এর অর্থ হলো নিজের আত্মাকে সংশোধন করা, নিজেকে খাঁটি করা, নাফস বা আত্মাকে পাপমুক্ত করা ইত্যাদি। আর সদা-সর্বদা আল্লাহ্ ও রসূলের স্মরণ, আনুগত্য ও ইবাদত ব্যতীত অন্য কিছু থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখাকে আত্মশুদ্ধি বলা হয়। তাছাড়া তরিকতের প্রথম স্তর হলো আত্মশুদ্ধি বা নিজকে সংশোধন করা।

আত্মশুদ্ধি সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মজীদে মহান আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا

তরজমা: নিশ্চয় সে সফল কাম হয়েছে, যে নিজেকে তথা স্বীয় আত্মাকে শুদ্ধ বা পবিত্র করেছে এবং সেই নিরাশ বা ব্যর্থ হয়েছে যে নিজেকে কলুষিত করেছে। অর্থাৎ নাফরমানীর মধ্যে আচ্ছন্ন করেছে।

[সূরা আশ-শামস, আয়াত-৯-১০]

এ আয়াতে কারমিা থেকে বুঝা যায় যে, মানুষের জন্য আত্মশুদ্ধি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা দেহ ও অন্তরের সমন্বয়ে মানুষের সৃষ্টি। এ দুইয়ের মধ্যে ক্বালব বা অন্তরের ভূমিকাই প্রাধান্য পাই। কেননা অন্তরই মানুষকে আমল বা কর্মের দিকে ধাবিত করে। তাই পার্থিব জীবনের সকল কাজ কর্মের বিশুদ্ধতার জন্য ক্বলবের সংশোধন বা আত্মশুদ্ধি নেহায়ত জরুরী। এ প্রসঙ্গে প্রিয়নবী রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

اَلَا وَاِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ [الحديث]

অর্থাৎ জেনে রেখো নিশ্চয় শরীরের মধ্যে এমন একটি সংামপিন্ড রয়েছে, যদি তা সংশোধিত বা বিশুদ্ধ হয়ে যায় তবে শরীর পুরোটাই বিশুদ্ধ হয়ে যায়। আর যদি তা (মাংসপিন্ড) দূষিত হয় তবে পুরো শরীরই কুলষিত হয়ে যায়। মনে রেখো তা হলো- ক্বলব বা অন্তর।

[সহীহ্ বুখারী ১ম খন্ড, হাদীস নং-৫২ ও সহীহ মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-১২১৯]

এছাড়াও পরকালীন সফলতা এবং মুক্তি ও শান্তি আত্মশুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নিজ আত্মাকে পবিত্র রাখবে পরকালে সেই মুক্তি শান্তি পাবে। যেমন মহান আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ (٨٨) اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ (٨٩)

তরজমা: সেদিন কোন সম্পদ কাজে আসবে না, না কাজে আসবে সন্তান-সন্তুতি বরং সেদিন ঐ ব্যক্তিই মুক্তি ও নাজাত পাবে যে আল্লাহর নিকট বিশুদ্ধ অন্ত:করণ নিয়ে উপস্থিত হবে।

[সূরা শু'আরা, আয়াত-৮৮-৮৯]

সুতরাং সিলসিলা বা তরিকতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে তথা বায়আত গ্রহণের পর প্রথম প্রচেষ্টা হতে হবে নিজকে সংশোধন করা। পীরের উপদেশ, নসীহত ইত্যাদি যথাযথ পালন করা।

ইসলামী জগতের অন্যতম দার্শনিক ইমাম মুহাম্মদ গাযালী রহমাতুল্লাহি আলায়হি 'এসলাহুনু নফস' নামক কিতাবে আত্মশুদ্ধির কিছু জরুরী বিষয় তুলে ধরেছেন। মূলতঃ আত্মাকে শুদ্ধ ও পবিত্র করতে হলে যেসব বিষয় নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করা প্রয়োজন তাহলো নিজের ঈমান-আক্বিদা শুদ্ধ রাখা, জ্ঞানার্জনে ব্রত থাকা, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ নির্ভর ও ভরসা রাখা, সবর তথা ধৈর্যশীল হওয়া, শোকর গুজার হওয়া, খালিচ অন্তরে আল্লাহর দরবারে তাওবা করা, আদব-শিষ্টাচার তথা উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া, পাক পবিত্র থাকা, পরহেযাগারী অবলম্বন করা, লৌকিকতা ও রিয়ামুক্ত হওয়া, মৃত্যু, কবর-হাশর-নশর ইত্যাদিকে ভয় করা এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দেওয়া ইত্যাদি। সুতরাং একজন তরিকতপন্থী মুসলমানের জন্য উপরোক্ত বিষয় অনুযায়ী আমল করা উচিত ও কর্তব্য। আর তাই অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নগ্নতা, ফিসক, গুনাহ্ নাফরমানী হতে বেচে কুরআন-সুন্নাহ্ হতে নির্গত হুকুম-আহকাম, বিধি-বিধান, ফরজ-ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল-মুস্তাহাব, হালাল-হারাম ও বৈধপন্থা মোতাবেক জীবন পরিচালনা করার নাম তরীকত। ঈমান-আক্বিদা বিশুদ্ধের পাশাপাশি নেক ও পূণ্য আমল ও বেশী বেশী করা একজন সত্যিকার মুরীদ বা তরিকতপন্থী মুসলমানের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য।

✍ **মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন**
পাবনা

প্রশ্ন: আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল এক নয়; কিন্তু আলাদা নয়। এ কথাটা কতটুকু শরীয়তসম্মত?

উত্তর: ইবাদত উপাসনার একমাত্র হকদার ও যোগ্য হলো মহান আল্লাহ্ তা'আলা। যিনি একক, অদ্বিতীয়, লা শরিক ও সর্বশক্তিমান। যা আমরা পবিত্র কুরআনের সূরা ইখলাস ও বিভিন্ন সুরার আয়াতে কারীমাহ্ হতে সুস্পষ্টভাবে জানতে পারি। মনে রাখতে হবে মহান আল্লাহ্ তা'আলা হলেন খালেক তথা সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টিকারী। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামসহ বাকি সকল কিছু হলো মাখলুক তথা আল্লাহর সৃষ্ট। স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা যেমন বেমেসাল বা তাঁর কোন সমকক্ষ নেই, তেমনি আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকুলের মধ্যে আমাদের নবী রাহমাতুল্লিল আলামিন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অতুলনীয় ও সকল সৃষ্টিকুলের জন্য তিনি রহমত সকল নবী-রসূলের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। সৃষ্টিকুলের সেরা মহামানব এবং সমস্ত নবীগণের ইমাম ও সরদার। আল্লাহ্ ও রাসূল এক নয় কিন্তু আলাদাও নয়' এ বাক্যে 'আলাদাও নয়' এর ব্যাখ্যা কয়েকভাবে করা যায়। যেমন- দ্বীনের ও ইসলামের হুকুম-আহকাম পালনের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান পবিত্র কোরআনের বাণী যেভাবে বান্দার জন্য অপরিহার্য তদ্রুপ প্রিয়নবীর বাণী ও হাদীসের বাণী উম্মতের জন্য পালন করা অপরিহার্য। নবীজির আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্য। এ প্রসঙ্গে অসংখ্য আয়াতে কারীমা রয়েছে।- যেমন-

مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ

তরজমা: যে রসূলের হুকুম ও নির্দেশ মান্য করল, নিঃসন্দেহে সে মহান আল্লাহর হুকুম ও নির্দেশ মান্য করল। [সূরা নিসা, আয়াত-৮০]

অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন-

اَطِيْعُوْا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا

তরজমা: তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং সতর্ক হও বা হারাম থেকে বেঁচে থাক।

[সূরা মায়েদা, আয়াত-৯২]

উপরোক্ত আয়াতে কারীমা হতে সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ ও রসূল উভয়ের আনুগত্য অবশ্যই করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কিন্তু আলাদা নয়, বলতে অসুবিধা নেই। অর্থাৎ এ আনুগত্যের দিক দিয়ে উভয়ের আনুগত্য আলাদা নয়। দ্বিতীয় আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে হেদায়ত দান করেন এবং প্রিয়নবীর আনুগত্যের মাধ্যমে ও মানুষ হেদায়ত প্রাপ্ত হয়। যেমন- কুরআনুল করীমে উল্লেখ রয়েছে- وَاِنْ تُطِيْعُوْا تَهْتَدُوْا যদি তোমরা রাসূলের আনুগত্য কর, তবে হেদায়তপ্রাপ্ত হবে এবং সৎ পথ পাবে। [সূরা আন-নুর, আয়াত-৫৪]

এ ক্ষেত্রেও আলাদা নয়। কেউ বললে অসুবিধা নেই। তাছাড়া কালিমা তাইয়্যেবা হলো لا اِلٰهَ الا الله مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ الله। এখানেও নবীজির নাম মোবারক মহান আল্লাহর নাম মোবারক হতে আলাদা পৃথক নয়। সাত আসমান, আট বেহেশত ও আরশ আজিমের নূরানী দরওয়াজায় মহান আল্লাহর পবিত্র নামের সাথে প্রিয় রাসূলের নূরানী নাম মোবারক অঙ্কিত ও সংযুক্ত। সুতরাং সুস্পষ্ট বিধান হলো আল্লাহ্ রাসূল নন এবং রাসূল আল্লাহ নন। অবশ্যই প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিয় বন্ধু ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল এবং গোটা সৃষ্টির জান ও প্রাণ। তাঁরই উপর লাখো দরুদ ও সালাম।

[আল কুরআন, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে রুহুল বয়ান ইত্যাদি]

▤ দু'টির বেশি প্রশ্ন গৃহীত হবেনা ▤ একটি কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় প্রশ্ন লিখে নিচে প্রশ্নকারীর নাম, ঠিকানা লিখতে হবে ▤ প্রশ্নের উত্তর প্রকাশের জন্য উত্তরদাতার সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়। ▤ প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা: প্রশ্নোত্তর বিভাগ, মাসিক তরজুমান, ৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা), দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০।

কোরবানির জরুরি মাসায়েল

রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, কোরবানি দিবসে মানুষের কোন নেক কর্মই আল্লাহ্‌র নিকট ততটুকু প্রিয় নয়, যতটুকু প্রিয় কোরবানির পশুর রক্ত প্রবাহিত করা। কোরবানির দিন পশুর রক্তের ফোঁটা মাটিতে পড়ার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তা কবুল হয়ে যায়। অতএব তোমরা আনন্দচিত্তে কোরবানি কর।

[আল্ হাদীস]

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- কোরবানির পশুর প্রত্যেক লোমের পরিবর্তে একটি করে সাওয়াব পাওয়া যায়। অন্য বর্ণনায় আছে, হাশরের দিবসে কোরবানিকৃত পশুগুলো কোরবানি দাতাগণকে আপন পৃষ্ঠে করে পুলসেরাত পার করিয়ে বেহেশ্‌তে পৌঁছিয়ে দেবে।

নিম্নে কোরবানির বিশেষ প্রয়োজনীয় মাসআলাগুলো উল্লেখ করা হল।

কোরবানি কার উপর ওয়াজিব

স্বাধীন ও মুক্বীম (অমুসাফির) ব্যক্তি যিনি মালেকে নেসাব অর্থাৎ এতটুকু সম্পদের অধিকারী হন যতটুকু সম্পদ হলে সাদক্বায়ে ফিত্‌র ও যাকাত প্রদান ওয়াজিব হয়, তার উপর কোরবানি ওয়াজিব। মালেকে নেসাব'র ব্যাখ্যা হল- মানুষের মৌলিক চাহিদা অর্থাৎ প্রয়োজনীয় খরচ ব্যতীত সাড়ে বায়ান্ন ভরি রৌপ্য ও সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা ওই পরিমাণ অর্থের মালিক হওয়া। মৌলিক চাহিদা বলতে বাসস্থান, আসবাবপত্র, অন্ন, বস্ত্র, চাকর, সফরের বাহন, হাতিয়ার ও পেশার সরঞ্জাম ইত্যাদি।

মাসআলা : যে ব্যক্তি সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন ভরি রৌপ্য বা এ পরিমাণ অর্থ অথবা এমন কোন সামগ্রীর মালিক হয়, যার মূল্য সাড়ে বায়ান্ন ভরি রৌপ্য পরিমাণ হয়, তাহলে সে ধনী হিসেবে বিবেচিত, তাঁর উপর কোরবানি ওয়াজিব। [আলমগীরী]

কোরবানির সময়

চান্দ্র মাস যিলহজ্বের ১০ হতে ১২ তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ তিনদিন দুই রাত।

মাসআলা : কেউ যদি বলে আমার ঐ কাজটি হয়, তাহলে আমি কোরবানি করব। অথবা আল্লাহ্‌র কসম এ পশুটিকে আমি অবশ্যই আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কোরবানি করব- এ দু'শ্রেণীর লোক ধনী হোক কিংবা গরীব হোক, এদের উপর কোরবানি ওয়াজিব। [বাদায়ে': ৫:৬২]

মাসআলা : কোন ধনী লোক মান্নতের কোরবানি দিলে, তার উপর যে কোরবানি ওয়াজিব, তা থেকে অব্যাহতি পাবেনা; বরং তার উপর পৃথকভাবে কোরবানি ওয়াজিব হবে; অর্থাৎ তাকে দু'টি কোরবানি দিতে হবে- একটি মান্নতের অপরটি মালেকে নেসাব হওয়ার কারণে। যদি কোরবানির দিন শপথ করে তাহলে শপথের কোরবানি দ্বারা ওয়াজিব কোরবানিও আদায় হয়ে যাবে।

মাসআলা: কোরবানির পশু ক্রয়ের আগে কোরবানির পশুর অংশীদার ঠিক করা উত্তম। পশু ক্রয়ের পর অন্য কাউকে অংশীদার বানাতে চাইলেও পারবে; কিন্তু মাকরূহ।

মাসআলা: কোন গরীব লোক কোরবানির নিয়্যতে পশু ক্রয় করলে ঐ পশু হারিয়ে যাওয়ার পর যদি আবার ফিরে আসে, তবে ওই পশুতে অংশীদার নেয়া মাকরূহ।

মাসআলা: জীবিতের কোরবানি, মৃত ব্যক্তির (ওসিয়তের) কোরবানি এবং আক্বীক্বাকারী কোরবানির পশুতে অংশীদার হতে পারবে; কিন্তু শর্ত হলো সবার উদ্দেশ্য যেন আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য হয়। কেউ যেন শুধু গোশ্‌ত খাওয়ার উদ্দেশ্যে কোরবানি না করে।

মাসআলা : কেউ যদি তার মৃত মা-বাবা ও দাদা-দাদীর কবরে সাওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে এক অংশ কোরবানি করতে চায়, তাহলে পারবে। এতে কোরবানিদাতা একজন হলেও সবাই সাওয়াবের অংশীদার হবে।

মাসআলা: প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ে অথবা স্ত্রীর অথবা এমন ব্যক্তির, যার উপর কোরবানি করা ওয়াজিব হয়েছে, ওয়াজিব কোরবানি তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে তাদের পক্ষ হয়ে কেউ কোরবানি করলে কোরবানির ওয়াজিব আদায় হবে না। এমনকি তার কোরবানির পশুর শরীকদার ব্যক্তিদের কোরবানিও হবে না। কিন্তু যার প্রতি বছর কোরবানি করার অভ্যাস আছে, তার কোরবানি জায়েয হবে। কিন্তু এ অবস্থায়ও অনুমতি বা পরামর্শ করা বেশী ভাল। [ফাত্‌ওয়া-এ কাযী খান : ২০২পৃষ্ঠা]

মাসআলা : কেউ কোরবানির পশু ক্রয় করার পর পশুটি হারিয়ে গেছে। এমতাবস্থায় আরেকটি পশু ক্রয় করার পর প্রথমে হারিয়ে যাওয়া পশুটিও আবার পেয়ে গেল। এ

অবস্থায় নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক না হলে অর্থাৎ যার উপর কোরবানি ওয়াজিব হয়নি, তার উপর দুটিই কোরবানি দেয়া ওয়াজিব। যদি মালেকে নেসাব হয়, তাহলে একটি যবেহ করলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। তবে প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয়টির মূল্য যাতে কম না হয়। কম হলে ওই পরিমাণ অর্থ সাদক্বা করে দেয়া ওয়াজিব।

[বাদায়ে': ৫ : ৬৬]

মাসআলা : কেউ যিলহজ্বের ১০-১২ তারিখ পর্যন্ত তিন দিন দুই রাতের মধ্যে যদি কোরবানি করতে সক্ষম না হয়, তাহলে তিনদিন পর ভেড়া বা ছাগলের মূল্য পরিমাণ অর্থ সাদক্বা করে দেয়া ওয়াজিব। যদি মুমূর্ষু হয়, তাহলে ওসিয়ত করা কর্তব্য।

মাসআলাঃ কোরবানি কাযা হয়ে যাওয়ার পর যদি কেউ কোন পশু যবেহ করে, তবে তা সাদক্বা করে দেয়া ওয়াজিব। যদি মূল্য কম হয়েছে বলে মনে হয় তবে যে পরিমাণ মূল্য কম হয়েছে বলে মনে হবে, সে পরিমাণ মূল্য সাদক্বা করে দেয়া ওয়াজিব। ওই পশুর যে পরিমাণ গোশ্‌ত নিজে অথবা বন্ধু-বান্ধবদের খাইয়েছে ওই পরিমাণ গোশ্‌তের মূল্য সাদক্বা করে দেয়া ওয়াজিব।

মাসআলাঃ কোরবানির ৩ দিনের মধ্যে অর্থাৎ যিলহজ্বের ১০-১২ তারিখের মধ্যে পশুর দাম সাদক্বা করে দেয়া হলে, কোরবানির ওয়াজিব আদায় হবে না এবং সব সময় গুনাহগার থেকে যাবে। কেননা কোরবানি তেমনই একটি ইবাদত, যেমন- নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত। যেভাবে নামায দ্বারা যাকাতের ফরজ আদায় হয় না, সেভাবে সাদক্বা দ্বারা কোরবানিও আদায় হয় না।

মাসআলাঃ কোরবানির দিনসমূহের মধ্যে কোরবানির নিয়তে মোরগ-মুরগী ইত্যাদি যবেহ করা মাকরূহ।

[আলমগীরী - ৪:১০৫]

কোরবানির পশুর বয়স

কোরবানির ছাগল কমপক্ষে ১ বছর, গরু ২ বছর এবং উট ৫ বছর বয়সের হতে হবে। কোরবানির জন্য সুন্দর ও নিখুঁত পশু বাছাই করা উত্তম। যেসব পশু অন্ধ ও খোঁড়া এমন যে, যবেহ করার স্থানে যেতে অক্ষম, শিং ভাঙ্গা, লেজ এবং কান কাটা বা দুর্বল ইত্যাদি পশু কোরবানির উপযুক্ত নয়।

কোরবানির পশু

গরু, মহিষ, উট, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা ইত্যাদি চতুস্পদ হালাল গৃহপালিত পশু দ্বারা কোরবানি করা জায়েয।

অংশীদারিত্বে কোরবানির নিয়ম

গরু, মহিষ ও উট এ তিন প্রকার পশুর প্রত্যেকটিতে এক হতে সাতজনের নামে কোরবানি করা যায়। তবে শর্ত হল সব ক'টি অংশ শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে হতে হবে; নিছক গোশত খাওয়ার খেয়ালও থাকতে পারবে না। এক পশুতে কয়েকজন শরীক থাকলে, গোশ্‌ত পাল্লা দিয়ে ওজন করে সমপরিমাণে ভাগ করে নিতে হবে।

কোন শরীকদার বেশী পেয়ে থাকলে অন্যরা মাফ করে দিলেও কারো কোরবানি বৈধ হবে না। সম্মিলিত কোরবানির পশু ক্রয় করার পর তাতে ভাগ বা অংশ অবশিষ্ট থাকলে অন্য লোককে শামিল করতে কোন অসুবিধা নেই। কেউ একা কোরবানি করার মানসে পশু ক্রয় করলেও তাতে অন্যকে শরীক করতে পারবে। তবে ক্রয় করার পূর্বে অংশীদার ভাগগুলো ঠিক করে নেয়া উত্তম; অন্যথায় মাকরূহ।

রাসূলে পাকের পক্ষ থেকে কোরবানি

আমাদের প্রিয় আক্বা ও মাওলা হযরত আহমদ মুজতাবা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সার্বজনীন মেহেরবানী দেখুন। তিনি স্বয়ং তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে কোরবানি করেছেন এবং ওই সময়ও উম্মতের কথা স্মরণ রেখেছেন। তাই এটা সৌভাগ্যের বিষয় হবে, যার পক্ষে সম্ভব, সে যেন হুযূর আকরামের জন্য কোরবানি করে। [বাহারে শরীয়ত]

গরু, উট দ্বারা কোরবানি করলে নফল হিসেবে এক ভাগ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে কোরবানি দেয়া অতি উত্তম। শরীকদারী কোরবানিতে শরীকগণ সবাই মিলে এক বা একাধিক অংশ হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পক্ষ থেকে কোরবানি দিতে পারবে।

কোরবানির গোশ্‌ত ভাগ করার নিয়ম

কোরবানির গোশ্‌ত ৩ ভাগে ভাগ করে এর ১ ভাগ গরীব ও ইয়াতীম-মিসকীনদের দান করা, ১ ভাগ আত্মীয়-স্বজনকে দেয়া এবং অন্য ভাগ নিজে রাখা মুস্তাহাব। কোরবানির পশু যবেহকারী ও গোশ্‌ত প্রস্তুতকারীকে

কোরবানির পশুর গোশ্ত থেকে পারিশ্রমিক স্বরূপ দেয়া যাবে না।

চামড়া

কোরবানির পশুর চামড়া, নাড়িভুঁড়ি, রশি ও ফুলের মালা প্রভৃতি সাদক্বা করে দিতে হবে। চামড়া সাদক্বা না করে নিজেও ব্যবহার করতে পারবে; যেমন- জায়নামায, বিছানা ইত্যাদি বানাতে পারবে। কিন্তু কোরবানির চামড়া বিক্রি করে এর মূল্য নিজ কর্মে ব্যয় করতে পারবে না। এ টাকা গরীব মিসকীনদের মাঝে সাদক্বা করে দেয়া ওয়াজিব।

চামড়া দ্বীনী-সুন্নী মাদ্রাসায়ও সাদক্বা করে দেয়া যায়, যদি উক্ত মাদ্রাসায় লিল্লাহ ফাণ্ড বা মিসকীন ফাণ্ড থাকে। কোরবানির পশুর পেটে জীবিত বাচ্চা হলে সেটিকেও যবেহ করে দিতে হবে। তখন সেটার গোশ্তও আহার করা যাবে। যদি মৃত হয় তাহলে ফেলে দিতে হবে। কোরবানির উদ্দেশ্যে ক্রয় করা পশু কোরবানির পূর্বে বাচ্চা দিলে সেই বাচ্চাকেও যবেহ করে দিতে হবে। অথবা বাচ্চা বিক্রি করে টাকাগুলো সাদক্বা করে দিতে হবে। বাচ্চা যদি কোরবানির দিনসমূহে যবেহ করা না হয়, তাহলে সাদক্বা করে দিতে হবে।

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোরবানি

যদি মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোরবানি দেয়া হয় তাহলে গোশ্ত উপরোল্লিখিত নিয়মে বন্টন করতে হবে। তবে যদি মৃত ব্যক্তির অসিয়ত পালনের উদ্দেশ্যে কোরবানি করা হলে তার সবটুকু সাদক্বা করে দেয়া ওয়াজিব।

কোরবানির পশু যবেহ করার নিয়ম

যবেহ করার নিয়ম জানা থাকলে কোরবানির পশু নিজ হাতে যবেহ করা মুস্তাহাব। যদি নিজে করতে না পারে, তাহলে অন্যের মাধ্যমেও তা সমাধা করা যাবে। তবে যবেহ্’র সময় নিজে সামনে থাকা উত্তম।

যবেহ্’র সময় নিম্নের রগসমূহ কাটার ব্যাপারে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে-

শ্বাসনালী, খাদ্যনালী এবং রক্ত চলাচলের রগ দু’টি। বক্ষস্থল হতে গলদেশের মধ্যবর্তী কোন স্থানে যবেহ করা বাঞ্ছনীয়। যবেহ্’র পূর্বে ছুরি খুব ধারালো করে নিতে হবে। তারপর কোরবানির পশুর মাথা দক্ষিণে এবং পেছনের দিক উত্তর দিকে রেখে ক্বেবলামুখী করে শায়িত করে এ দু’আ পড়তে হবে।

দু’আ

‘ইন্নী ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাত্বারাস সামাওয়াতী ওয়াল আরদ্বা হানীফাঁও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন, ইন্না সালাতী ওয়ানুসুকী ওয়া মাহ্য়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়ালাকা বিস্মিল্লাহি আল্লাহু আকবর’ বলে কোরবানির পশু যবেহ করার পর পাঠ করবেন- ***‘আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন্নী*** (অংশীদার থাকলে- ***‘ওয়া মিন’*** বলার পর প্রত্যেকের নাম ও বাপের নাম) ***কামা তাকাব্বালতা মিন খলীলিকা ইব্রাহীমা আলায়হিস্ সালাম ওয়া হাবীবিকা মুহাম্মাদিনিল মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।’***

এ দু’আ জানা না থাকলে যাদের জন্য কোরবানি হবে তাদের নামগুলো স্মরণ করে মনে মনে নিয়ত করে নিয়ে কোরবানি করলেও দুরস্ত হবে।

ঈদুল আযহা নামাযের নিয়ম

সূর্য ওঠার পর হতে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত ঈদুল আযহার নামাযের সময়। এ দিন মিস্ওয়াক ও গোসল করবেন। তারপর ভাল কাপড় পরিধান করে, খোশ্বু লাগিয়ে তাকবীর বলতে বলতে ঈদগাহের দিকে রওয়ানা হবেন।

নামাযের নিয়ত

নাওয়াতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা’আলা রাক্’আতায় সালাতি ঈদিল আদ্বহা মাআ’সিত্তি তাকবীরাতিন ওয়াজিবিল্লাহি তা’আলা ইক্বতিদায়তু বিহা-যাল ইমাম, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা’আবাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

যদি নামাযের নিয়ত জানা না থাকে তাহলে এভাবে বাংলায় নিয়্যত করবেন- আমি ঈদুল আযহার ২ রাক্’আত নামায ৬ তাকবীরের সাথে আল্লাহর ওয়াস্তে কেবলামুখী হয়ে এই ইমামের পিছনে ইক্বতিদা করে আদায় করছি তারপর ‘আল্লাহু আকবর’ বলে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে নাভীর নিচে হাত বেঁধে নামায শুরু করবেন। অতঃপর সানা (***সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বি হামদিকা ওয়া তাবা-রকাস্মুকা ওয়া তা’আ-লা- জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলা-হা গায়রুকা***) পাঠান্তে ‘আল্লাহু আকবর’ বলে ৩টি অতিরিক্ত তাকবীর বলতে হবে এবং হাত কানের লতি পর্যন্ত উঠিয়ে ছেড়ে দেবেন, বাঁধবেন না; কিন্তু তৃতীয় তাকবীরের পর হাত বেঁধে নেবেন এবং মনযোগ দিয়ে ইমামের ক্বিরাআত শুনবেন।

ক্বিরাআতের পর রুকূ'-সাজদার মাধ্যমে প্রথম রাক্'আতের পরে দ্বিতীয় রাক্'আতের রুকূ'তে যাওয়ার পূর্বক্ষণে ইমাম ৩টি অতিরিক্ত তাকবীর বলবেন তখন মুক্বতাদীগণ কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে প্রত্যেক বারই হাত ছেড়ে দেবে। অতঃপর যথারীতি রুকূ'-সাজদার মাধ্যমে ঈদুল আযহার নামায সমাপ্ত করবেন। নামাযের পর মন দিয়ে চুপচাপ ইমামের খুতবা শ্রবণ করবেন। ইমাম তাকবীর বলার সময় মুক্বতাদীগণও মনে মনে তাকবীর বলবেন।

কোরবানি দিবসের করণীয়

হাদীস শরীফ- হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিত্রের দিন মিষ্টি জাতীয় কিছু আহার করে ঈদগাহে তাশরীফ নিতেন; কিন্তু ঈদুল আযহার দিবসে নামায আদায় না করা পর্যন্ত কিছুই আহার করতেন না। [তিরমিযী, দারিমী ও ইবনে মাজাহ]

মাসআলাঃ ঈদুল আযহায়ও ঐসব বিষয়ই মুস্তাহাব, যেগুলো ঈদুল ফিত্রে ছিল। তবে ঈদুল আযহার ভিন্নতা হলো যে, নামাযের পূর্বে কিছু না খাওয়া, (খেলে কোন ক্ষতি হবে না বা মাকরূহও হবে না)। ঈদগাহে যাওয়ার সময় উঁচু আওয়াজে তাকবীর বলা, ঈদুল আযহার নামায কোন কারণ বশত ১২ যিলহজ্ব পর্যন্ত দেরী করা যাবে এরপর নয়। তবে বিনা কারণে ১০ যিলহজ্ব থেকে বিলম্ব করা মাকরূহ। [আলমগীরী]

মাসআলাঃ যারা কোরবানি করবে তাদের ১ যিলহজ্ব থেকে ১০ যিলহজ্ব পর্যন্ত দাঁড়ি, চুল না ছাঁটা ও নখ না কাটা মুস্তাহাব। [রদ্দুল মুখতার]

তাকবীর-ই তাশরীক্ব

যিলহজ্বের ৯ তারিখের ফজর থেকে ১৩ তারিখের আসর পর্যন্ত জামা'আতে শরীক সকল মুক্বতাদী ও ইমামের উপর ফরয নামায আদায়ের পর ১বার উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করা ওয়াজিব এবং ৩ বার পড়া উত্তম। ঈদুল আযহা ও জুম'আর নামাযের পর পাঠ করা অপরিহার্য।

তাকবীর

আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হাম্দ।

মাসআলাঃ তাকবীর নামাযের সালাম ফিরানোর পরপর পড়া ওয়াজিব। যদি কেউ সালামের পর পর তাকবীর না পড়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়, অথবা ওযূ নষ্ট করে ফেলে, অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে আলাপ-আলোচনা শুরু করে দেয়, তবে সে গুনাহগার হবে। কিন্তু অনিচ্ছাকৃত বা ভুলবশত হলে পরে পড়ে নিতে হবে। একা নামায আদায়কারীর উপর তাকবীরে তাশরীক্ব পড়া ওয়াজিব নয় তবে পড়া উত্তম।

আক্বীকা

অনেককে কোরবানির সাথে আক্বীকাও আদায় করতে দেখা যায়। তাই নিম্নে আক্বীকা সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা হল।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার শুকরিয়াস্বরূপ যে পশু (গরু-ছাগল) যবেহ করা হয় তাকে আক্বীকা বলে।

মাসআলা : আক্বীকা করা সুন্নাত এবং এর জন্য সন্তান জন্মের ৭ম দিনই উৎকৃষ্ট যদি সম্ভব না হয়, তাহলে ৭ দিনের মধ্যে যে কোন দিন আদায় করলেও সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ আক্বীকা ছেলে সন্তান হলে দুই অংশ আর মেয়ে সন্তান হলে এক অংশ।

মাসআলাঃ কোরবানির সাথে আক্বীকাও সম্পৃক্ত করা যাবে।

মাসআলাঃ কোরবানির পশুর জন্য যে শর্ত আক্বীকার পশুর জন্যও অনুরূপ শর্ত।

মাসআলাঃ আক্বীকার গোশ্ত আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কাঁচা অথবা রান্না করে জেয়াফত আকারে বিতরণ করা যায়।

মাসআলা : আক্বীকার গোশ্ত পিতা-মাতা, দাদা-দাদী সবাই খেতে পারবে; তাতে কোন বাধা নেই।

মাসআলা : আক্বীকার চামড়ার হুকুম কোরবানির চামড়ার হুকুমের আওতায় পড়বে।

কুরআন ও সুন্নাহর প্রাতিষ্ঠানিক রূপকার

আওলাদে রাসূল আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি)

মাওলানা আহমদুল্লাহ ফোরকান খান আলকাদেরী

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের খিদমতে নিয়োজিত লেখক ও মাঠে ময়দানের আলোচকদের প্রায় একটি প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্নটি হচ্ছে, আপনারা কুরআন সুন্নাহর আলোচনা করেন ভালো কথা। ব্যক্তির জীবন বা তাদের জীবনের নানা দিক আলোচনা করেন কেন?' তাদের আপত্তি হচ্ছে, আউলিয়ায়ে কিরামের জীবনী, কারামাত, কর্মময় জীবন ইত্যাদী বিষয়ের আলোচনা করা অনর্থক এবং সময় নষ্ট ছাড়া কিছুই নয়।

আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম ও আউলিয়া সালিহীন এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীদের এই অবান্তর অভিযোগের জবাব কুরআন ও সুন্নাহয় সুস্পষ্টভাবেই আছে। কুরআন ও হাদীসে পূর্বেকার নবীগণের উম্মতের আউলিয়ায়ে কিরামের জীবন, কর্ম ও কারামাতের আলোচনা বেশুমার। আমরা এ প্রবন্ধে কুরআন ও সুন্নাহর নিক্তিতে আওলাদে রাসূল আল্লামা হাফেয ক্বারী সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ রহমাতুল্লাহি আলায়হির জীবন ও অবদানকে অনুধাবনের চেষ্টা করবো। যাতে প্রমাণিত হবে তিনি পুরো জীবনটাই কুরআন ও সুন্নাহকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যয় করেছেন। সে সাথে এটিও প্রমাণিত হবে বুযুর্গানে দ্বীনের আলোচনা কুরআন ও সুন্নাহর সিলেবাস বহির্ভুত কিছু নয়।

উল্লেখ্য এ লেখাটি হুজুর কিবলা রহঃ এর জীবনী নয়।বরং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে উনার জীবন ও কর্মের সর্বজন স্বীকৃত খিদমত সমূহের মূল্যায়ন।

এক. তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওলাদ

আহলে বায়ত এবং নবীজির বংশের মর্যাদা নিয়ে আল্লাহ পাক বলছেন, قُل لَّآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ أَجۡرًا إِلَّا ٱلۡمَوَدَّةَ فِي ٱلۡقُرۡبَىٰۗ الشورى: 23

তরজমা: "আপনি বলুন, 'আমি সেটার জন্য তোমাদের নিকট থেকে কোন পারিশ্রমিক চাই না, কিন্তু চাই নিকটাত্মীয়তার ভালোবাসা'।" [সূরা শূরা, আয়াত- ২৩]

হাদীসে পাকে এসেছে, হযরত মিসওয়ার বিন মাখরামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إن الأنساب يَوْمَ الْقِيَامَةِ تنقطع غير نسبي وسببي وصهري.

অনুবাদঃ" নিশ্চয় কিয়ামতের দিন বংশের পরিচয় ছিন্ন হয়ে যাবে কেবলমাত্র আমার বংশীয়, গোত্রীয় ও বৈবাহিক পরিচয় ছাড়া।"

[মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৮৮০৯ ।প্রকাশকঃ দারুল হাদীস, মিশর]

উপরোক্ত একটি আয়াত ও হাদীস থেকে আওলাদে রাসূলগণের ভালবাসা ও মর্যাদা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। সুতরাং হুজুর কিবলা আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ রহঃ একজন আওলাদে রাসূল হওয়ায় উনার আলোচনা কুরআন ও সুন্নাহর আলোচনা পরিপন্থী নয়।

দুই. তিনি অসংখ্য মানুষকে হেদায়তের পথ প্রদর্শন করেছেন

গাউসে জমানের হাতে বায়আত গ্রহণ করে অসংখ্য মানুষ দ্বীনের পথে ফিরে এসেছেন। নামাযী হয়েছেন। তাহাজ্জুদ গুজার হয়েছেন। তরীকতের সবক দানকালীন নির্দেশ পালন করতে গিয়ে হালাল রিজিক উপার্জনের চেষ্টা করছেন। ইসলামের ফরয সুন্নাহ সহ সব ধরণের বিধান পালনে সচেষ্ট আছেন। মানুষকে হিদায়তের দিকে আহবানের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কিত একটি আয়াত ও একটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

কুরআনে এসেছে,

{وَمَنۡ أَحۡسَنُ قَوۡلٗا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ} [فصلت: 33]

তরজমা: "এবং তার চেয়ে কার কথা অধিক উত্তম, যে আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে; আর বলে, 'আমি মুসলমান'।" [সূরা ফুচ্ছিলাত, আয়াত নং ৩৩]

হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً.«

অনুবাদঃ ''কেউ যদি হিদায়াত তথা সুপথের দিকে আহ্বান করে তাহলে সে তার অনুসারীর সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে। তবে অনুসরণকারীদের সাওয়াব থেকে মোটেও কমানো হবে না। আর গোমরাহী তথা পথভ্রষ্টতার দিকে আহ্বানকারী ব্যক্তি তার অনুসারীদের পাপের সমপরিমাণ পাপের অংশীদার হবে, তবে তাদের (অনুসরণকারীদের) পাপ থেকে মোটেই কমানো হবে না।''

[মুসলিম শরীফ, কিতাবুল ইলম, হাদীস নং ৬৮০৪]

তিন. **তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিকামী ও জঙ্গীবাদ বিরোধী জনমত সৃষ্টিতে সুস্পষ্ট ভুমিকা রেখেছেন**

ইসলামে জিহাদের বিধান স্বতঃসিদ্ধ। এটিকে অস্বীকার করা কুফর। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে নজদী ও শিয়া মতবাদপুষ্ট জঙ্গীবাদীরা যেভাবে কথায় কথায় জিহাদের ডাক দিচ্ছে; বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করছে; মানুষের জানমালের ক্ষতি করছে তা জিহাদের মোড়কে সন্ত্রাসবাদ ব্যতীত কিছুই নয়।

এই বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদের প্রতি মানুষের মনে ঘৃণা সৃষ্টির পাশাপাশি ইসলামী জিহাদের সঠিক সংজ্ঞা তুলে ধরার মাধ্যমে সারা বিশ্বে জঙ্গীবাদ বিরোধী জনমত সৃষ্টি করেছেন তরীক্বতের মাশায়েখে কিরাম ও সুফীবাদী ইসলাম প্রচারকগণ।

এই শান্তিকামী ইসলামের সঠিক ও অবিকৃত মূলধারার একজন অবিসংবাদিত রাহবার হচ্ছেন গাউসে জামান হুজুর কিবলা তৈয়ব শাহ রহমাতুল্লাহি আলায়হি।

কুরআন কারীমে এসেছে,

مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ }

[المائدة: 32]

তরজমা: ''যে ব্যক্তি প্রাণ হত্যা করলো কোন প্রাণ হত্যার বদলা ও পৃথিবী পৃষ্ঠে ফ্যাসাদ করা ছাড়াই, তখন সে যেন সকল মানুষকেই হত্যা করলো। আর যে ব্যক্তি একটা প্রাণ বাচালো, সে যন সকল মানুষকেই জীবিত রাখলো।'' [সূরা মায়িদাহ, আয়াতঃ ৩২]

চার. **অসংখ্য আলিমে দ্বীন তৈরী করেছেন**

উনার আব্বাজান ক্বিবলা আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি চট্টগ্রামে পৃথিবী বিখ্যাত ইলমে দ্বীনের মারকায জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া প্রতিষ্ঠা করার পরও তিনি এদেশের ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বিভিন্নস্থানে অর্ধশতাধিক মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। লাখো আলিমে দ্বীন উপহার দিয়েছেন। হাদীস শরীফের ভাষ্য অনুযায়ী যে ইলমের ধারাবাহিকতা ও সওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত প্রবাহমান থাকবে। এভাবে তিনি এদেশের মুসলমানদের চিরঋণী করেছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, ইরশাদ করেছেন,

((إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)).

অনুবাদঃ ''মানুষ যখন মৃত্যু বরণ করে তখন তার আমলের সুযোগও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমলের সওয়াব বন্ধ হয় না। এক. সদাক্বাহ জারিয়া। দুই. এমন জ্ঞান যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং তিন, নেক সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে।''

[সুনানে আবূ দাউদ, কিতাবুল ওয়াসায়া, বাবু মা জাআ ফিস সাদাক্বাতি আনিল মায়্যিতি, হাদীস নং ২৮৮০]

পাঁচ. **জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান**

হুজুর ক্বিবলার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক ইয়াতিমখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনগ্রসর ও অনুন্নত এলাকায় দ্বীনি শিক্ষার প্রদীপ প্রজ্জলিত হয়েছে। হুজুর ক্বিবলার নির্দেশিত গাউসিয়া কমিটির তত্বাবধানে শহরে

গ্রামে দুঃস্থ ও দরিদ্র মানুষের সহায়তা কার্যক্রম এ দরবারের দৈনন্দিন কর্মসূচীতে পরিণত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমার রাদ্বিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

((الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

অনুবাদঃ “এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার ভাইয়ের উপর জুলম করবেনা এবং অন্য কারো জুলুমের শিকার হতে দিবে না । কেউ যদি কোন মুসলমানের একটি সমস্যা দূর করে তাহলে আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিনের একটি দুঃখ দূর করবেন। যদি কোন মুসলিমের দোষ গোপন করে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন ।" [বুখারী শরীফ, কিতাবুল মাযালিম, হাদীস নং ২৪৪২]

ছয়. অসংখ্য আলিম, ইমাম, হাফেজ তৈরীতে প্রত্যক্ষ ভুমিকা রেখেছেন

হুজুর ক্বিবলার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা থেকে অসংখ্য ইমাম ও হাফেয তৈরী হয়েছেন । ইমামদের দুনিয়াবী মর্যাদা সর্বজন স্বীকৃত বিষয় । পরকালে তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীস শরীফটি প্রণিধান যোগ্য ।

হযরত উসমান বিন আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ

অনুবাদঃ " কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর মানুষ (পাপীদের জন্য) সুপারিশ করবে।নবীগণ আলাইহিমুস সালাম, আলিমগণ ও শহীদগণ ।

[সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুয যুহদ, বাবু যিকরিশ শাফা'আতি, হাদীস নং ৪৩১৩]

হাফেযে কুরআনের মর্যাদা বিষয়ে হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَاسْتَظْهَرَهُ وَحَفِظَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ

অনুবাদঃ “যে কুরআন শিক্ষা করলো, তার উপর আমল করলো এবং মুখস্ত করলো আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তার পরিবারের এমন দশজনের জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা দিবেন যাদের জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে । অর্থাৎ হাফিযে কুরআনের সুপারিশের কারণে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে জান্নাত দান করবেন ।”

[মুসনাদে আহমদ, মুসনাদু আলী ইবনে আবি তালিব রাঃ, দ্বিতীয় খন্ড, হাদীস নং ১২৭৭, প্রকাশকঃ দারুল হাদীস মিশর]

মসজিদের ইমামের মর্যাদা বর্ণনায় হাদীসে পাকে এসেছে, হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলল্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ

অনুবাদঃ “ইমাম হচ্ছেন জামিনদার, আর মুয়াযযিন আমানতদার । হে আল্লাহ, ইমামদেরকে হেদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো এবং মুয়াযযিনদেরকে ক্ষমা করে দাও ।”

[জামিউত তিরমিযী, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং ২০৭]

সাত. আহলে সুন্নাতের প্রচার করেছেন

উনার পুরো জীবনের খিদমতের প্রধান লক্ষ্য ছিল ইসলামের সঠিক ও অবিকৃত মতাদর্শ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতকে প্রতিষ্ঠা করা । এভাবে তিনি মূলতঃ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশকেই বাস্তবায়িত করেছেন ।

হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ
أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا
وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي)).

অনুবাদঃ “নিশ্চয় বনী ইসরাঈল বাহাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মত তিয়াত্তর ফিরকায় বিভক্ত হবে। একটি দল ছাড়া সকলেই জাহান্নামী। সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ঐ নাজাত প্রাপ্ত দল কোনটি? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি ও আমার সাহাবায়ে কিরামের (আদর্শবাহী) দল।”

[তিরমিযী শরীফ, কিতাবুল ঈমান, বাবু মা জাআ ইফতিরাক্বি হাযিহিল উম্মাহ, হাদীস নং ২৬৪১]

আট. সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন এবং ইসলামে ভাল রীতির প্রচলন

এদেশে ব্যাপকভাবে দরূদ শরীফ পাঠ, মিলাদ, ক্বিয়াম, জুলূস এসবের প্রচলন করে তিনি মূলতঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের এর সুন্নাতকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কারণ মুসলিম সমাজে কুরআন ও সুন্নাহ সমর্থিত কোন কিছু প্রচলন করাকে সুন্নাত বলা হয়েছে। বিদআত বলা হয়নি।

হযরত জারীর বিন আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شيء وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.

অনুবাদঃ “যদি কেউ ইসলামের মধ্যে কোন ভাল সুন্নাতের (রীতি) প্রচলন করে এবং পরবর্তীতে সে রীতিটি মানুষের মধ্যে চর্চিত হয় তখন সে ঐ সুন্নাতের আমলকারীদের সওয়াবও পাবে। তবে আমলকারীদের সওয়াব কমানো হবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি সমাজে কোন মন্দ রীতি চালু করে এবং ঐ মন্দ রীতির চর্চা করা হয় তবে সে ঐ কাজের আমলকারীদের গুনাহের অংশীদার হবে। কিন্তু পাপীদের গুনাহ থেকে একটুও কমানো হবে না।”

[মুসলিম শরীফ, কিতাবুল ইলম, বাবু মান সান্না সুন্নাতান্, হাদীস নং ৬৮০০]

নয়. মাসিক তরজুমান সহ দ্বীনি কিতাব রচনা

হুজুর ক্বিবলার প্রতিষ্ঠিত মাসিক তরজুমান সুন্নীয়তের বাতিঘর হিসেবে কাজ করছে। এছাড়াও হুজুর কিবলার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাগুলো থেকে শিক্ষা অর্জন করে হাজারো মুফতি, মুহাদ্দিস, লেখক ও গবেষকের সৃষ্টি হয়েছে। যাদের লেখনী ও রচনা মাযহাব মিল্লাতের অফুরন্ত খিদমত আনজাম দিচ্ছে। এ প্রকাশনার মাধ্যমে অসংখ্য লেখক ও গবেষক সৃষ্টির নেপথ্যে হুজুর কিবলার অবদান ইনশা আল্লাহ অম্লান থাকবে চিরকাল।

হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

((إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ
مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا))

অনুবাদঃ “নিশ্চয়ই আল্লাহ এই উম্মতের জন্য প্রতি একশত বছরের শিরোভাগে এমন লোকের আবির্ভাব ঘটাবেন, যিনি এই উম্মাতের দীনকে তার জন্য সঞ্জীবিত করবেন।”

[সুনানে আবূ দাঊদ, কিতাবুল মালাহিম, বাবু মা ইউযকারু ফী ক্বরনিল মিআতি, হাদীস নং ৪২৯১]

লেখক: আরবী প্রভাষক, রাউজান দারুল ইসলাম কামিল মাদরাসা, রাউজান, চট্টগ্রাম।

আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হির জীবনী গ্রন্থ আলোচনা

লেখক: আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান

আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জমান

ক্বোরআন ও হাদীস লিপিবদ্ধ করার ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে ইতিহাস রচনা ও মনীষীদের জীবন চরিত সংরক্ষণের জন্য প্রথা অনুসৃত হয় সেই আদিকাল থেকে। হাদীস সংকলণের মধ্যেও সুপ্ত ছিল এ প্রথার নির্দেশনা। কারণ হাদসি শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হলো আমাদের প্রিয় নবীর পবিত্র জীবন গাঁথা। প্রিয় নবীর বাণী, কাজ ও সমর্থনকে যদি হাদীস বলা হয়, তবে তাঁর জীবন চিত্রেরই অপর নাম হাদীসে রসূল। আবার পবিত্র ক্বোরআন শরীফের ব্যবহারিক রূপ হচ্ছে নবী পাকের হায়াতে জিন্দেগী। এ দিক বিবেচনায় বলা যায়, ক্বোরআন-হাদীস মানে এক কথায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনাদর্শ, প্রিয় নবীরই জীবন দর্পণ। মহাপুরুষদের জীবনধারাই প্রজন্মের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। সিরাতে মুসতাক্বীম বা সরল সঠিক পুণ্য পন্থা আমাদের আজন্ম অন্বেষা। আল্লাহ্ তা'আলা সিরাতে মুসতাক্বীমের পরিচয় দিয়ে বলেছেন, এটা হলো তাঁদেরই জীবনপন্থা, যাঁদের উপর আমার নেয়ামত বা একান্ত অনুগ্রহ হয়েছে। সেই অনুগ্রহ প্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন সালেহীন বা আউলিয়া-ই কেরাম। তাঁদের অনুসৃত পথই সিরাতে মুস্তাকীম, ইসলামের যেটা অভ্রান্ত দর্শন। এ বোধ থেকেই কাজী নজরুল ইসলাম বলেছিলেন,

'ইসলাম সে তো পরশমণি, তারে কে পেয়েছে খুঁজি,
পরশে তাঁহার সোনা হল, যাঁরা তাঁদেরই মোরা বুঝি।

পূর্বসূরী আউলিয়া-ই কেরামের পুণ্যময় জীবনধারা উত্তরসূরী গুণগ্রাহীদের জন্য অপার্থিব প্রাপ্তি। তাই মানুষ ভক্তি-শ্রদ্ধায় তাঁদের জীবন চরিত রীতিমত অধ্যয়ন করে আসছে প্রতি যুগে। "পূর্বেকার লোকদের জীবনে বোদ্ধা লোকের জন্য শিক্ষণীয় আদর্শের কথা ক্বোরআনেই বিধৃত। [১২ঃ১১১]

এ পুণ্যধারায় এশিয়াখ্যাত শ্রেষ্ঠ দ্বীনি বিদ্যাপীঠ বাংলার আযহার চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার স্বনামধন্য অধ্যক্ষ আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান একান্ত নিষ্ঠা ও সাধনাসম পরিশ্রমের মাধ্যমে লক্ষ মু'মিনের আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক, উপমহাদেশের প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধক ওলীকুল শিরমণি, যুগের ওয়াইস ক্বরনী, গাউসে জমান কুতুবুল এরশাদ আলে রাসূল আল্লামা হাফেয ক্বারী সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হির পবিত্র জীবনী সংকলন ও গ্রন্থনার কাজটি সম্পাদন করেছেন। এ গুরুত্বপূর্ণ ও দুরূহ কাজটি সম্পাদন করে তিনি নিঃসন্দেহে মিল্লাত ও মাযহাবের সেবায় রেখেছেন এক অপরিমেয় অবদান। এ মূল্যবান গ্রন্থের ৪র্থ সংস্করণ শেষের পথে। এ গ্রন্থের উপর কিছু লিখতে পেরে নিজকে ধন্য মনে করছি।

মূল্যবান গ্রন্থটি রচনায় তাঁর প্রচুর মেধা, শ্রম, নিষ্ঠা ও সময় ব্যয় করার বিষয়টি অনস্বীকার্য। তাছাড়া যে মনীষীর জীবনী রচনা করেছেন, তিনি যে কতো উঁচু মাপের আধ্যাত্মিক সাধক ও শরীয়ত-তরীক্বতের কতো মহান দিকপাল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মু'মিনের জীবনের সার্থকতা যে বিষয়টির উপর নির্ভরশীল, সেই ঈমানের প্রাণশক্তি তথা নবী-প্রেমের দীক্ষা দিয়ে যে ক'জন মহান ব্যক্তিত্ব জগতজোড়া ইমেজ নিয়ে অমর হয়ে আছেন, মুর্শিদে বরহক হুযূর ক্বেবলা আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁদের অন্যতম। মুর্শিদে বরহক্ব তাঁর প্রিয় কবি ড. ইকবালের একটি বিখ্যাত পংক্তি প্রায়শঃ আবৃত্তি করতেন-

'কী মুহাম্মদ সে ওয়াফা তূ নে, তু হাম তেরে হ্যাঁয়,
ইয়ে জাহাঁ চীয হ্যায় কেয়া লওহো ক্বলম তেরে হ্যাঁয়।

বলাবাহুল্য, নবী-ভক্তির তাৎপর্য এ লাইন দু'টিতে বিধৃত হয়ে আছে। এ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, তিনি কোন সে পয়গাম নিয়ে ছুটে ছিলেন দেশ থেকে দেশান্তরে। কোন সে মন্ত্রণায় তিনি মানুষকে উজ্জীবিত করতে সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এ উপমহাদেশের অদ্বিতীয় আশেকে রাসূল হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরেলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র না'ত শুনে বিভোর হয়ে তিনি বলতেন, "ইনকে শে'রোঁ মে এৎনী তা'সীর, খোদা জানে উনকে দিল কী কেয়া হালত!" নবীপ্রেমের সে উচ্ছ্বাসকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে তিনি তাঁর

নির্দেশনায় চালিত শিক্ষা নিকেতনে প্রাত্যহিক সমাবেশে 'সব সে আওলা ওয়ালা হামারা নবী, ভক্ত মুরীদানের মজলিসে 'মুস্তফা জানে রহমত পে লাখোঁ সালাম' পাঠের নির্দেশনা দিয়েছেন। সে মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে দেশের সমকালীন সুন্নিয়তের পুনর্জাগরণের কিংবদন্তী অগ্রনায়ক, পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু উস্তাযুল ওলামা শেরে মিল্লাত মুফতী ওবাইদুল হক নঈমী রচিত একটি লাইন অবিস্মরণীয় বলে মনে হয়েছে। 'সো-য মে রুমী ও জামী, ওয়াইসে করনীয়ে যমাঁ, শাব্বীর ও আত্তার জেয়সে...'' বাস্তবিকই আধ্যাত্মিকতার এ মহান দিকপাল মুর্শিদে বরহকের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণার সমগ্রটাই জুড়ে রয়েছে প্রিয়নবীর প্রেমজাত উৎকণ্ঠিত আবেদন। যা প্রেমিক-হৃদয় স্পর্শ না করে যায় না।

গ্রন্থটি এগারোটি অধ্যায়ে গ্রথিত, যাতে অলীকুল সম্রাট গাউসে জীলানী শাহানশাহে বাগদাদ হযরত আবদুল ক্বাদের জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর গেয়ারভী শরীফের নিসবত বা যোগসূত্রিতার প্রয়াস লক্ষ্যণীয়। গাউসে পাকের আওলাদ এবং তাঁরই তরীক্বতের একজন যোগ্য সাজ্জাদানশীন খলীফা হিসেবে মুর্শিদে বরহক্বও বায়'আতের সময় মুরীদানের উদ্দেশ্যে বলতেন, ''তোমাদের সিলসিলার এ রূহানী সম্পর্ক শাহানশাহে বাগদাদের মাধ্যমে আজ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাথে স্থাপিত হলো। গাউসে পাকের একান্ত অনুরক্ত হিসেবে তাঁরই নামে 'গাউসিয়া কমিটি' প্রতিষ্ঠা করে একদিকে গাউসে পাকের সম্পর্কটাও যেমন প্রকাশ করেছেন, সাথে সাথে মহান সংগঠক হিসেবে রেখেছেন দূরদর্শী সাংগঠনিক প্রজ্ঞার উজ্জ্বল প্রমাণ। আর তাঁরই জীবন চরিত গাউসে পাকের সম্পর্কের ইঙ্গিতসূচক এগারো অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে গ্রন্থকারও দিয়েছেন তত্ত্ববোধের পরিচয়।

ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় প্রদত্ত হুযুর কেবলার বংশগত পরিচয় জীবনী হিসেবে বইটির সমাদর বাড়াবে নিঃসন্দেহে। সচরাচর এ দিকটা গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয় কম। মুর্শিদে বরহক্বের তরীক্বতের শাজরা তো লক্ষ মু'মিনের মুখে ওয়াযীফা হিসাবে নিয়মিতভাবে পঠিত হয়ে আসছে। এ গ্রন্থে নসবী শাজরা উপস্থাপন পূর্বক আমাদের মুর্শিদে করীম প্রিয় নবীর ৪০তম আওলাদে পাক হওয়ার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর বিভিন্ন সূত্রের বরাত দিয়ে উপস্থাপিত হওয়ায় তা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তর্কাতীতভাবে।

জাহেরী ও বাতেনী উভয়বিধ জ্ঞানে পরিপূর্ণ না হয়ে কেউ কামিল পীর হিসেবে অনুসারীদের পথ দেখাতে পারেন না। এমনকি সত্যিকার সুশিক্ষা বিবর্জিত হয়ে কেউ আল্লাহর মা'রিফাত অর্জন করতে পারে না। এ জন্য শেখ সাদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন, 'কেহ বে-ইলম নাতাওয়াঁ খোদারা শনাখত' (জ্ঞানহীন মানুষ কখনো খোদার পরিচয় পেতে পারে না।) হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজে জ্ঞান দান করার পর ফেরেশতাদের সামনে তাঁর পরীক্ষা নিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ''আদমকে সাজদা করো।'' তাই মুর্শিদে কামিলকে শরীয়ত ও তরীক্বতের তত্ত্ব জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে হয়। মুর্শিদে বরহকের জ্ঞানগর্ব তাক্বরীর ও নসিহতই তাঁর ইলমী যোগ্যতার প্রমাণ বহন করে। শৈশবে পবিত্র ক্বোরআন মজীদ কণ্ঠস্থ করে ইলম তাজভীদের সমন্বয়ে তাঁর সুললিত কণ্ঠের তেলাওয়াত শ্রোতামন্ডলীকে এক অপার্থিব সুধা বিতরণে বিভোর করে রাখত। তাফসীর ও সুক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানে তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ। মাদরাসা-এ রহমানিয়া ইসলামিয়া, হরিপুর থেকে ক্বোরআন, হাদীস, উসূল, ফিক্বহ'র ব্যুৎপত্তি ও পান্ডিত্য অর্জন করেন। গ্রন্থকারের বর্ণনা মতে অসাধারণ স্মৃতি-শক্তির বদৌলতে সাতাশ বছর বয়সে ১৯৪৩ খৃস্টাব্দে তিনি শিক্ষার সর্বশেষ সনদ লাভ করেন। (শিক্ষাজীবন দ্রষ্টব্য)

এ ছাড়া গোড়ার দিকে মৌলিক বুনিয়াদী শিক্ষা এবং তাসাউফের গভীর জ্ঞান তিনি স্বীয় পিতা কুত্বুল আউলিয়া সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি থেকে লাভ করেন। নিজে সুশিক্ষা লাভ করে ক্ষান্ত হননি, দেশ-বিদেশে শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা দিতে গিয়েই তিনি বলতেন, 'কাম করো, দ্বীন কো বাঁচাও, সাচ্চা আলেম তৈয়ার করো।'

আল্লাহ্ তা'আলা যাঁদের ভালবাসেন, তাঁদের কাছ থেকে তিনি রিয়াযত ও সাধনার পরীক্ষা নেন। আম্বিয়া-ই কেরাম থেকে আউলিয়া কেরামের কেউ এ সাধনার নিয়ম বহির্ভূত ছিলেন না। নবীগণের কেউ বেহেশত থেকে দুনিয়ায় এসে অনুশোচনায় কেঁদেছিলেন শত শত বছর, কেউ বা দেশ ছেড়ে বেরিয়েছেন দেশান্তরে, কেউবা জেলখানায় কয়েদী হয়েছিলেন, কঠিন পীড়ায় সর্বাঙ্গ আক্রান্ত অবস্থায় সাধনায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন কেউ। আমাদের নবীর জীবনে আরো কঠিন কঠিন স্তর অতিক্রান্ত হয়েছিল। শাহানশাহে বাগদাদ গাউসে পাক বনের ফলমূল এমনকি গাছের পত্রপল্লব খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করেছিলেন, একাধারে চল্লিশ বছর এশার

ওযুতে ফজরের নামায পড়ার কথাও তাঁর জীবনীতে পাওয়া যায় । মুর্শিদে বরহক্ব হুযূর ক্বেবলা রহমাতুল্লাহি আলায়হিও এ নিয়মকে হাসিমুখে আলিঙ্গন করেছিলেন । হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম তাওরাত গ্রহণকালে চল্লিশ দিন ই'তিকাফ করেছিলেন । মুর্শিদে বরহক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একাধারে ৪০ দিন বুযুর্গ পিতা শাহানশাহে সিরিকোট রহমাতুল্লাহি আলায়হির অন্তিমকালে যে রিয়াযত করেছিলেন তার নজীর বিরল । এ গ্রন্থের খেলাফত লাভ অংশে গ্রন্থকার কিছুটা আভাস দিয়েছেন । “একটানা ৪০ দিন পর্যন্ত স্বীয় মুর্শিদ ও আব্বাজান কেবলা হযরত সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর শয্যাপাশে অবস্থান করে হুযূর ক্বেবলা তৈয়্যেব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি সেবা শুশ্রূষায় রত ছিলেন । এ দিনগুলোতে তিনি নিমিষের জন্যও সেবা বিমুখ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েননি বা অন্য কোথাও চলে যাননি ।’

বেলায়ত নুবূয়তের ছায়া সদৃশ । এ জন্য প্রত্যেক ওলীর জীবনে কোন না কোন নবীর জীবনের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় । তাই আউলিয়া-ই কেরামের জীবনে, সাধনার ধরনেও দেখা যায় বিভিন্নতা । একেকজন একেকটি সাধনার পথ অবলম্বন করেন । ক্যান্সারের চাইতে হাজার গুণ ভয়াবহ লিমফোমা রোগ শরীরে ধারণ করেও হুযুর কেবলা রহমাতুল্লাহি আলায়হিকে বিষণ্ন হতে দেখা যায়নি । কুশল জিজ্ঞেস করা হলে ওই সময় তিনি প্রফুল্ল মুখে বলতেন, ‘আগের চেয়ে ভাল বোধ করছি ।’ অসহ্য রোগ যন্ত্রণাকে বরণ করে তিনি সবরে আইয়্যুবীর অনুশীলন করে গেছেন । গ্রন্থকার এ বিষয়টি কারামত অধ্যায়ে উল্লেখ করে বলেছেন, ‘ক্যান্সার থেকেও হাজারগুণ ভয়াবহ রোগ ধারণ করে আছেন শরীরে অথচ রোগ যন্ত্রণায় কোন দিন ‘উহ’ শব্দটি উচ্চারণ করেননি ।’

আর তাঁরই যোগ্য খলীফা বর্তমান সাজ্জাদানশীন হুযূর ক্বেবলা আল্লামা তাহের শাহ্ মুদ্দাযিল্লুহুল আলীকে আমরা দেখেছি স্বীয় পিতা ও মুর্শিদের খেদমতে পুত্রের পরিচয়ে নয়; বরং একজন আজ্ঞাবাহী সেবকের মতো দাঁড়িয়ে থাকতেন । আল্লামা জামী রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র শে'র যেন সেখানে মূর্তরূপ পেয়ে যায়-‘বান্দায়ে ইশ্ক্ব শুদী, তর্কে নসব কুন জামী ।’ (জামী! আত্মীয়তার দাবী বাদ দিয়ে ইশক্বের বান্দা হয়ে যাও ।) তিনিও বলতেন, “জী নেহী চাহ্তা কেহ্ বগায়র খেদমতকে কেসী কো কুচ দোঁ ।’ কারামত বা অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন কোন ওলীর জন্য অপরিহার্য নয় । তাছাড়া মুর্শিদে বরহক্বের জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি নিজের গাউসিয়াতের ক্ষমতাকে বরাবর লুকিয়ে রাখতেন । অনাড়ম্বর, সাদাসিধে, সহজ সরল জীবনে অভ্যস্থ ছিলেন । নিজের বুযুর্গী জাহির করা তাঁর অপছন্দ ছিল । যে কোন বিষয়কে তিনি হযরাতে কেরামের দিকে সম্পর্কিত করে নিজকে গোপন রাখতে ভালবাসতেন । তথাপি বহু কারামত তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রকাশ পেয়ে যেত, স্বল্প পরিসরে যার ফিরিস্তি দেওয়াও সম্ভব নয় ।

এ রকম বিশেরও অধিক ঘটনা জীবনীকার এ গ্রন্থের কারামত অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেছেন । যেমন নিঃসন্তানকে সন্তান দান, লন্ডন হাসপাতালে চিকিৎসকের হতভম্ব হয়ে যাওয়া, বাগদাদ শরীফ ও আজমীর শরীফের ঘটনা, হুযুর কেবলার বার্মা সফরের ঘটনা, ত্রিতল ভবনের ছাদ থেকে পড়েও ভক্তের রেহাই পাওয়া, এক বালকের প্রাণ রক্ষা, দুর্ঘটনা থেকে বিমান রক্ষা পাওয়া, বে-আদবীর পরিণাম, ড্রাইভারের ভুল স্বীকার, বাতিলদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ এভাবে অসংখ্য অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর পবিত্র জীবনে । ভক্তের ভক্তি ও আশেক্বের মুহাব্বত আরো বাড়াতে কারামতের ঘটনাবলী পাঠ করা প্রয়োজন । এ ঘটনাসমূহ গ্রন্থনায় গ্রন্থকারের সযত্ন প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য ।

মালফুযাত (বাণীসমূহ), তাক্বরীরাত (ভাষণসমূহ) ও মাকতুবাত (চিঠিপত্র) ভবিষ্যত গবেষকদের জন্য ঐতিহাসিক দলীলের কাজ দেবে । সহায়ক উপাত্ত হিসেবে এ রেকর্ডগুলো দুষ্পপ্রাপ্য সংগ্রহই বটে । মাকতুবাতে ইমাম রব্বানী সকল তরীক্বতপন্থীর জন্য, বিশেষত তাঁর অনুসারীদের জন্য যেমন অমূল্য পাথেয় বলে বিবেচিত, তেমনি মুর্শিদে বরহক্বের অনুরক্ত, রূহানী সন্তানদের জন্যও এগুলো অমূল্য নির্দেশনা ও মূল্যবান স্মারক ।

ঝাঁকে ঝাঁকে সাচ্চা আলেম তৈরীর স্বপ্নদ্রষ্টা শাহানশাহে সিরিকোট রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে হুযুর ক্বেবলা রহমাতুল্লাহি আলায়হির প্রতিষ্ঠিত দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা তাঁর দূরদর্শিতার জ্বলন্ত স্বাক্ষর । ঢাকার ক্বাদেরিয়া তৈয়্যেবীয়া আলিয়া, হালিশহর তৈয়্যেবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল মাদরাসাসহ বহু মাদরাসার তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের খেদমতে এক অতুলনীয় অবদান রেখে গেছেন । এভাবে প্রতিষ্ঠানসমূহ সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য বলিষ্ঠ এক পরিচালনা কমিটিও রেখে যান ।

'আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া' এ দেশে আজ এক বিশাল দ্বীনী সংস্থা হিসাবে সমাদৃত। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শরীয়ত ও তরীক্বতের খিদমত পৌঁছিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে 'গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করে তিনি অসাধারণ সাংগঠনিক প্রজ্ঞার স্বাক্ষর রেখেছেন, যার বিস্তারিত বিবরণ এ জীবনীগ্রন্থে ঠাঁই পেয়েছে।

হুযূর কেবলার যে অসাধারণ বৈশিষ্ট্য সর্বমহলের দৃষ্টি কেড়েছে, তা হলো তাঁর সংস্কারধর্মী পদক্ষেপসমূহ। দিশেহারা জাতির ভাগ্যে তিনি একজন মহান সংস্কারক ও ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। আমাদের মুর্শিদে বরহক বিবিধ বিষয়ে সংস্কার সাধন করে মুসলিম মিল্লাতের অবর্ণনীয় উপকার সাধন করেছেন। জশনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, সালাত ও সালাম, না'তে রাসূলের ব্যাপক চর্চা, ঘরে ঘরে আধ্যাত্মিক অনুশীলনের যে বিপ্লব তিনি এনেছেন, সত্যিকার অর্থে ইসলামের মৌলিক রূপরেখার ভিত্তিতে বাতিল ফির্কার স্বরূপ চেনাতে জাতির সম্মুখে তা দিশারীর কাজ করবে। সঠিক বিশ্বাসের ভিত্তি মজবুত রাখতে পারাই মু'মিনের মুক্তি ও সাফল্যের প্রথম শর্ত। মুর্শিদে বরহকের বাস্তব ও মৌলিক বিষয়ে আলোকপাত করে সম্মানিত গ্রন্থকার মু'মিনের চেতনাকে শানিত করেছেন। হুযূর কেবলার সংস্কারমূলক কার্যক্রম অধ্যায়টি প্রতিটি মুসলমানের পড়ে নেয়া প্রয়োজন।

প্রকাশনার জগতে সুন্নী জনতার দৈন্যদশা দেখে হাল ধরেছিলেন প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ কেবলা। আহলে সুন্নাতের প্রধান মুখপত্র তরজুমানে আহলে সুন্নাতের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে একে দিয়েছেন অনন্য সমৃদ্ধি। 'ইয়ে তরজুমান বাতেল ফেরকোঁ কেলিয়ে মওত হ্যায়' তাঁর এ বাণী মুসলিম মিল্লাতের পাঠকদের রুচি নির্ধারণে এবং সুন্নী প্রকাশনার জোয়ার সৃষ্টিতে মাইলফলক হয়ে থাকবে। উপরোক্ত উপস্থাপনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সম্বলিত এ জীবনীগ্রন্থ অধ্যয়ন করে জ্ঞান-ভান্ডারকে যেমন সমৃদ্ধ করা যাবে, তেমনি আউলিয়া-ই কেরামের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা আরো গভীর হবে, যা তাঁদের ফয়ূযাত লাভের সহায়ক হবে নিঃসন্দেহে। এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে মুবারকবাদ ও গ্রন্থকারের প্রচেষ্টার ফসলকে অভিনন্দিত করছি। আমি এ গ্রন্থের আরো ব্যাপক-প্রচার কামনা করছি। পাশাপাশি কুতুবুল আউলিয়া, বানিয়ে জামেয়া, হাফেজ ক্বারী, আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হির জীবন-কর্ম ও বিশাল খেদমতের উপর এ ধরনের তথ্যবহুল একটি জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করা সময়ের দাবী। আশা করি আনজুমান প্রকাশনা বিভাগ এগিয়ে আসবেন। আল্লাহ্ ও রসূল এ মহতী উদ্যোগকে হযরাতে কেরামের ওসীলায় কবুল করুন, । আমিন।

লেখক: আরবী প্রভাষক, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

৬২তম সালানা ওরস মাহফিলে বক্তারা-

ইসলামি শিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতার পুনর্জাগরনে আল্লামা সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকোটি (র.) চির স্মরণীয়

আওলাদে রাসূল, রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরিকত আল্লামা সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকোটি (র.) বাংলাদেশসহ ভারত উপমহাদেশে সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরীয়ার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন। তিনি পাকিস্তান-আফ্রিকা-বার্মা হয়ে বাংলাদেশে আগমণ করে কাদেরিয়া তরিকার মূল ধারার প্রচার ও প্রসার ঘটান। একইসাথে তিনি ইসলামের সঠিক রূপরেখার আহলে সুন্নাতের আক্বীদা ও সুফিবাদ প্রসারে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন, যে প্রতিষ্ঠান আজ বিশ্বব্যাপী সুনাম অর্জন করেছে। তিনি মূলত এ বাংলা থেকেই ইসলামি শিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতার পুনর্জাগরণ ঘটান। গত ২৩ জুন বুধবার নগরীর ষোলশহরস্থ আলমগীর খানকাহ শরীফে আনজুমান-এ রাহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট ও জামেয়ার প্রতিষ্ঠাতা আওলাদে রাসুল আল্লামা সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকোটি (র.) এর ওরশ মোবারক উপলক্ষে স্মারক আলোচনায় বক্তারা এ কথা বলেন। তাঁরা আরো বলেন, আল্লামা সিরিকোটি (র.) আপন মাতৃভূমি থেকে বাংলাদেশে এসে ইসলামের সঠিক মতাদর্শ প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে নেতৃত্ব প্রদানের ফলে তাঁর হাতে সুন্নিয়তের পূনর্জীবন ঘটে, যা আজ সত্যনিষ্ঠ নিরপেক্ষ মহল অকপটে স্বীকার করেন। আজো তাঁর হাতে গড়া চট্টগ্রামের জামেয়া-আনজুমান বাংলাদেশের সুন্নিদের নির্ভরতার প্রধান ঠিকানা হিসেবে অব্যাহত আছে। সিরিকোটি(র.)-এর আন্‌জুমানের হাতে পরিচালিত হয় শতাধিক মাদরাসা। বক্তারা বলেন, সিরিকোটি (র.) এর হাতে কাদেরিয়া ত্বরিকায় যেমন নতুন জোয়ার আসে, তেমনি এ দেশবাসী লাভ করে “মসলকে আলা হযরত” নামক সুন্নিয়তের বিশুদ্ধতম ধারার সন্ধান। আনজুমানের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্মরক আলোচনায় বক্তব্য রাখেন আনজুমান’র সেক্রেটারি জেনারেল আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন, আনজুমানের অ্যাডিশনাল জেনারেল সেক্রেটারি আলহাজ্ব সামশুদ্দীন, অ্যাসিস্টেন্ট জয়েন্ট সেক্রেটারি আলহাজ্ব মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন সাকের, প্রেস এন্ড পাবিলিকেসন্স সেক্রেটারি অধ্যাপক কাজী সামশুর রহমান, জামেয়ার চেয়ারম্যান অধ্যাপক দিদারুল ইসলাম, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ। হুজুর সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবন ও কর্মের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়দ অছিয়র রহমান, আনজুমান রিচার্স সেন্টারের মহাপরিচালক আল্লামা এম.এ.মান্নান, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা’আতের চেয়ারম্যান আল্লামা কাজী মঈনুদ্দিন আশরাফী, জামেয়ার শায়খুল হাদিস আল্লামা হাফেজ সোলায়মান আনসারী, মুহাদ্দিস আল্লামা হাফেজ আশরাফুজ্জমান আলকাদেরী, অধ্যক্ষ আল্লামা বদিউল আলম রিজভী, জামেয়া দায়েম নাজির জামে মসজিদের খতিব আল্লামা আবুল আসাদ জুবায়ের রজভী, গবেষক অধ্যাপক সৈয়দ জালাল উদ্দিন আল আজহারী, গাউসিয়া কমিটির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ারুল হক, মহাসচিব শাহজাদ ইবনে দিদার, যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার। মাওলানা হাফেজ আনিসুজ্জমানের সঞ্চলনায় অনুষ্ঠিত স্মারক আলোচনায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, দক্ষিণ জেলার সভাপতি আলহাজ্ব কমরুদ্দিন সবুর, উত্তর জেলার সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) জমির উদ্দিন মাস্টার, গাউসিয়া কমিটি চট্টগ্রাম নগরের আলহাজ্ব মাহবুব অলম, মহানগর সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ্ব তাসকির আহমদ, উত্তর জেলার সম্পাদক অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, দক্ষিণ জেলার সম্পাদক হাবিব উল্লাহ মাস্টার, মহানগর সম্পাদক আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, আলহাজ্ব মনোয়ার হোসেন মুন্না, মাওলানা মোহাম্মদ ইলিয়াছ আলকাদেরী প্রমুখ। সালানা ওরস মোবারক উপলক্ষে দিনব্যাপী কর্মসূচীর মধ্যে ছিল-সকাল ৮টা থেকে খত্‌মে কোরআন মাজীদ, খত্‌মে বোখারী শরীফ, খত্‌মে মজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রাসুল(দঃ) ও পবিত্র গেয়ারভী শরীফ, বা’দ আছর হতে হযরাতে মাশায়েখ কেরামের জীবনী আলোচনা এবং সালাত ও সালাম পরিবেশন করেন জামেয়ার মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন আযহারী। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জামেয়ার আরবী প্রভাষক পরিশেষে, জামেয়ার অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান বাংলাদেশসহ সমগ্র মুসলিম জাহানের শান্তি কামনা করে দো’য়া ও আখিরী মুনাজাত পরিচালনা করেন। বা’দ নামাজে এশা তবারুক বিতরণের মাধ্যমে মাহফিল’র সমাপ্তি হয়।

খানকায়ে কাদেরিয়া সৈয়দিয়া তৈয়্যবিয়া

নগরীর বলুয়ারদীঘির পাড় খানক্বায়ে কাদেরীয়া সৈয়দিয়া তৈয়্যবিয়ায় আলে রসূল মুর্শিদে বরহক্ব হাফেজ ক্বারী সৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহ.)’র পবিত্র সালানা ওরস উপলক্ষে দিনব্যাপী মাহফিলে শানে সিরিকোট ও স্মারক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। গত ২২ জুন সমাপনী দিবসে

আয়োজিত মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন, প্রদান ওয়াইজ ছিলেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার মুদার্‌রিস মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল গফুর রেজভী, বক্তব্য রাখেন গাউসিয়া কমিটির যুগ্ম মহাসচিব এড. আলহাজ্ব মুছাহেব উদ্দিন বখতেয়ার।

হবিগঞ্জ জেলা গাউসিয়া কমিটি

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ হবিগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে আলে রাসূল, আল্লামা সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.) এর সালানা ওরস মোবারক গত ২২ জুলাই তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া গাউছিয়া খানকা শরীফে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্ব মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান। হুজুর কিবলার জীবনী আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত হবিগঞ্জ জেলার সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা শাহ জালাল আহমদ আখঞ্জী, হবিগঞ্জ কেন্দ্রীয় ঈদগাহ এর খতিব মাওলানা গোলাম মোস্তফা নবীনগরী, আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত হবিগঞ্জের সিনিয়র সহ সভাপতি মাওলানা সুলায়মান খান রাব্বানী, গাউছিয়া জামে মসজিদের খতিব মুফতি আবু ছাফওয়ান মোহাম্মদ আশরাফুল ওয়াদুদ, অনন্তপুর জামে মসজিদের খতিব মুফতি মুজিবুর রহমান আল ক্বাদরী, মাওলানা কাজী সাইফুল মোস্তফা, মুফতি ফজলুল হক, ক্বারী মাওলানা আবু তৈয়্যব মুজাহিদী, মাওলানা খায়ের উদ্দিন, মাওলানা ফরাস উদ্দিন, মাওলানা আবু তাহের, হাফিজ মাওলানা শফিকুল ইসলাম প্রমুখ। অধ্যক্ষ গোলাম সারওয়ারে আলম এর সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ আলহাজ্ব শফিউল আলম চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক আলহাজ্ব হারুনুর রশীদ সাহিদ, সহ সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ আইয়ুব আলী, অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, আলহাজ্ব দেওয়ান মাসুদুর রহমান চৌধুরী, হাফেজ ক্বারী মাওলানা কামারুল হুদা, আলহাজ্ব মোহাম্মদ মজলিশ মিয়া, মোঃ আব্দুল আজিজ, মোহাম্মদ সানু মিয়া, মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা বারের সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব এডভোকেট আব্দুর রউফ, আলহাজ্ব এডভোকেট আফতাব উদ্দিন, মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম (বি.এস.সি) প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। পরিশেষে পবিত্র গিয়ারভী শরীফ মিলাদ ও মোনাজাতে দেশ ও জাতির কল্যাণে মহান আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানানো হয়। আগামী ১লা জিলহজ্ব খাজা আব্দুর রহমান চৌহরভী (রহ্.), ১০ জিলহজ্ব গিয়ারভী শরীফ ও ১৫ জিলহজ্ব হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ্.)'র পবিত্র ওরস মোবারক পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

রংপুর জেলা গাউসিয়া কমিটি

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ রংপুর জেরা শাখার উদ্যোগে আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহির ওরশ মোবারক ও মাসিক গিয়ারভী শরীফ জেলা গাউসিয়া কমিটির উদ্যোগে আলহাজ্ব আব্দুল কাদির খোকন এ-র সভাপতিত্বে নিউ ইঞ্জিনিয়ার পাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে হযরত সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহির জীবনী আলোচনা করেন হাফেজ মাওলানা আইয়ুব আলী আনসারি। মাহফিল পরিচালনা করেন মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কাসেম সুপার জিয়াত পুকুর মাজার শরীফ দাখিল মাদ্রাসা। উপস্থিত ছিলেন মান্নান শরীফ বাবলু, মাওলানা নুরমুহাম্মাদ,সাইফুল ইসলাম, আলহাজ মজিবুর রহমান, আলহাজ্ব মকবুল হোসেন, জাকির হোসেন আশরাফি,মাওলানা আব্দুস সালাম,ইমু মিয়া, মোস্তাক আহমেদ। মোনাজাত করেন মাওলানা আইয়ুব আলী আনছারী।

টাঙ্গাইল জেলা গাউসিয়া কমিটি

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ টাঙ্গাইল জেলা শাখার ব্যবস্থাপনায় গত ২৩ জুন গিয়ারভী শরীফ ও হযরত হাফেজ ক্বারী সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.)'র সালানা ওরস মোবারক অনুষ্ঠিত হয়। একই সঙ্গে গাউসিয়া কমিটি টাঙ্গাইল জেলা শাখার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মরহুম মাওলানা হুমায়ুন কবির এর মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। অনুষ্ঠানে হুজুর কেবলার জীবনের নানা দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন কাদেরিয়া তৈয়বিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসার সুপার এইচ এম মোজাম্মেল হক , মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, সেক্রেটারি মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, অধ্যাপক মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুর রহমান এবং ইসমাইল হোসেন প্রমুখ। সভাপতির ভাষণে আলহাজ্ব অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আব্দুল হাই হুজুর কেবলার আধ্যাত্মিক ক্ষমতার বর্ণনা দেন। মিলাদ শরীফ, কিয়াম শরীফ এবং মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

বরমা ইউনিয়ন গাউসিয়া কমিটি

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চন্দনাইশ বরমা ইউনিয়ন শাখার উদ্যোগে গত ২৭ জুন বরকল মৌলভী বাজারস্থ মোস্তাফা কনভেনশন সেন্টারে, আওলাদে রাসুল আল্লামা হাফেজ সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকোটি (রহ.)'র সালানা ওরশ

মোবারক অনুষ্ঠিত হয়। মুহাম্মদ ফোরকান সওদাগরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ (কমিশনার)। উদ্বোধক ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ কমর উদ্দীন সবুর। প্রধান আলোচক ছিলেন কেন্দ্রীয় যুগ্ম-মহাসচিব এডভোকেট মোছাহেব উদ্দীন বখতিয়ার। বিশেষ অতিথি ছিলেন মাস্টার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল গফুর খান, আলহাজ্ব মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম। আলোচনায় বক্তারা বলেন, শাহানশাহ্ সিরিকোট আল্লামা হাফেজ সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি পেশোয়ারী (র.) এমন এক বাতিঘর ছিলেন যে, যার রশ্মিতে আলোকিত হয়েছে সুদূর আফ্রিকা, বার্মা, বাংলা, পাক-ভারতসহ এশিয়ার বিশাল এক ভূখন্ড। ইসলামের জন্য নিবেদিত বীর পূর্বপুরুষদের ত্যাগের ঐতিহ্য বজায় রেখে তাঁর দীর্ঘ ১০৮ বছরের ইহজীবনের সবটুকুই উৎসর্গ করেছিলেন শরিয়ত-ত্বরিকতের খেদমতে। তার প্রতিষ্ঠিত আন্জুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট এদেশের সুন্নিদের আশা-ভরসার জায়গা হিসেবে দেখা হয়। তিনি ছিলেন ইসলামের সমুজ্জ্বল বাতিঘর। হাজী মুহাম্মদ ফেরদৌস আলমের পরিচালনায় মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন, আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবু তাহের, ডাঃ শাহ আলম, মোস্তফা কামাল মন্টু, হারুনুর রশিদ মেম্বার, আবুল মঞ্জুর চৌধুরী মেম্বার, কাজী জাকের হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান মেম্বার, হাজী নওশা মিয়া মেম্বার, শাহ আলম মেম্বার, মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, জাবেদ মোহাম্মদ গউস মিল্টন, আলহাজ্ব আব্দুল মন্নান চৌধুরী, সরওয়ার কামাল লিটন, জাহাঙ্গীর আলম, মাওলানা ওসমান গনী, নাছির উদ্দিন চৌধুরী, মিজানুর রহমান হাসান, মাওলানা মাহবুব আলম, মাওলানা কামরুদ্দীন নুরী, এ কে এম নাইম উদ্দিন, আবু সাঈদ আসিফ প্রমূখ।

লতিফপুর ওয়ার্ড গাউসিয়া কমিটি

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, পাহাড়তলী থানার আওতাধীন লতিফপুর ওয়ার্ড এর উদ্যোগে ও চৌধুরী মসজিদ ইউনিটের সহযোগিতায় আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ (রহ.)র ওরস মোবারক ও খতমে গাউসিয়া শরীফ চৌধুরী মসজিদে গত ৩০ জুন অনুষ্ঠিত হয়। এতে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জিনা কাজী জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব মাওলানা আইয়ুব আলী রাসেল ও চৌধুরী মসজিদের খতিব মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল হক, লতিফপুর ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন ও মোহাম্মদ মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে আরো বক্তব্য রাখেন ও কৈবল্যধাম ইউনিটের সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা শ.ম জাকারিয়া, আলীর হাট ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক রবিউল হোসেন বাবু, মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী, মোহাম্মদ হোসেন, মোহাম্মদ সাজরাতুল ইয়াকিন শাওয়াল, ফরহাদ হোসেন বাদশা, মোহাম্মদ আরমানসহ বিভিন্ন ওয়ার্ড ইউনিটের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ড

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ৯নং উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ড শাখার উদ্যোগে কুতুবুল আউলিয়া বানিয়ে জামেয়া আওলাদে রাসুল হযরতুলহাজ্ব আল্লামা সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকোটি (রহ.) ও শেরে মিল্লাত মুফতী আল্লামা ওবায়দুল হক নঈমী (রহ.)র ফাতিহা শরীফ উপলক্ষে মাহফিল গত ২৭ জুন মাহমুদ খান জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে মুসলিম মিয়ার সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম সওদাগরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পাহাড়তলী থানার সাধারন সম্পাদক মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দীন, বক্তব্য রাখেন পাহাড়তলী থানার সহ সভাপতি হাজ্বী নুর মোহাম্মদ সওদাগর, সদস্য শেখ আহমদ ছাফা, ৯নং ওয়ার্ডের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক মুহাম্মদ আলমগীর হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক নাইমুল হাসান তানভীর, সহ অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ আবু বক্কর সিদ্দিক, নোয়াপাড়া ইউনিটের সাধারন সম্পাদক আতিকুর রহমান হৃদয়, ইস্পাহানী ইউনিটের সহ সভাপতি মুহাম্মদ মামুন, কৈবল্যধাম ইউনিটের সাধারন সম্পাদক ডাঃ জসিম উদ্দীন, দাওয়াতে খায়র সম্পাদক মুহাম্মদ জাহিদুর রহমান জাকারিয়া, ফয়েসলেক ইউনিটের সদস্য মুহাম্মদ সিরাজুল মোস্তফা, সাকিব, আমির হাসান, ইসতিয়াক, রিফাত, ইয়াকিন প্রমুখ। উক্ত মাহফিলে মোনাজাত পরিচালনা করেন মাহমুদ খান জামে মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মওলানা আবদুল হালিম।

১ম ওফাত বার্ষিকী স্মারক কনফারেন্সে বক্তারা-

শেরে মিল্লাত আল্লামা ওবায়দুল হক নঈমী ছিলেন সুন্নিয়তের ময়দানের সিংহপুরুষ

সিলসিলাহ্ আলিয়া কাদেরিয়ার মূখপাত্র আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আতের চেয়ারম্যান, শেরে মিল্লাত, মুফতিয়ে আহলে সুন্নাত আল্লামা মুফতি ওবায়দুল হক নঈমী ছিলেন এক ক্ষণজন্মা আলেমে দ্বীন। কিংবদন্তিতুল্য ইসলামি বক্তা, মোনাযির (তার্কিক) এবং যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস। বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রদত্ত ওয়াজের ময়দানে তাঁর তেজদ্বীপ্ত জ্ঞানগভীর বক্তব্য খোদাদ্রোহী ও নবীদ্রোহীদের মনে কম্পন সৃষ্টি করত। ইসলামের নামে ছদ্মবেশী ভ্রান্তমতবাদীদের স্বরূপ উম্মোচনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আপোষহীন সিংহপুরুষ। একজন খাটি আশেকে রসূল ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসাবে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সুফিবাদী দর্শনের আলোকে সুন্নিয়তের প্রচার-প্রসার ছিল তাঁর মিশন ও ভিশন। তিনি সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরিয়ার মশায়েখ-ই এজামের একান্ত অনুরক্ত এবং এ ত্বরিকার একজন মূখপাত্র হিসাবে নিজেকে সদা নিয়োজিত রাখলেও সকল হকপন্থী সুন্নি পীর মশায়েখ ও ওলামায়ে কেরামের প্রতি ছিলেন গভীর শ্রদ্ধাশীল। আল্লামা নঈমীর সুদীর্ঘ ছয় দশকের মিশনারী কার্যক্রমের অধিকাংশই ব্যয় করেছেন শিক্ষকতা পেশায়। যার প্রায় চারদশক ছিলেন এশিয়া বিখ্যাত দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার দরসে হাদিস, ফিক্হ ও তাফসিরে। একজন দায়িত্বশীল ও শিক্ষক হিসাবে আল্লামা নঈমী ছিলেন হাজারো ছাত্রের অতিপ্রিয় শিক্ষাগুরু। জীবনের শেষ নিঃশ্বাসের পূর্ব পর্যন্ত তিনি জামেয়ার শ্রেণি কক্ষে ও আলমগীর খানকাহ্ শরীফে বিশেষ ক্লাসে হাদিসের দরস দিয়েছেন। অপরদিকে সুন্নী মুসলমানদের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আতের। পদলোভহীন, নিরহঙ্কার ও সহজ-সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত আল্লামা নঈমীই একমাত্র আলেম যার উপাধী 'শের-ই মিল্লাত', সমকালীন দুনিয়ার আলেম সমাজে আর দ্বিতীয় কেউ নেই। গত ২৬ জুন শনিবার বিকালে নগরীর ষোলশহরস্থ আলমগীর খানকায় শেরে মিল্লাত আল্লামা মুফতি ওবায়দুল হক নঈমী (র.) এর স্মরণে আয়োজিত শেরে মিল্লাত কনফারেন্স-এ এ কথাগুলো বলেন। আল্লামা মুফতি ওবায়দুল হক নঈমী (র.)'র ১ম ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষে শেরে মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আয়োজিত কনফারেন্স-এ সভাপতিত্ব করেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি অছিয়র রহমান আল-কাদেরী। প্রধান অতিথি ও প্রধান আলোচক ছিলেন আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র সি.ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আত বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান আল্লামা কাজী মঈনুদ্দিন আশরাফী। অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ও বিশেষ অতিথি ছিলেন- আনজুমান রিসার্চ সেন্টার'র মহাপরিচালক আল্লামা এম.এ মান্নান, আনজুমান ট্রাস্ট'র সেক্রেটারি জেনারেল আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার, যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, আহলে সুন্নাত সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)'র সভাপতি আল্লামা হাফেজ সোলায়মান আনসারী, জামেয়ার উপাধ্যক্ষ আল্লামা ড. লিয়াকত আলী, প্রধান ফক্বিহ মুফতি আল্লামা কাযী আবদুল ওয়াজেদ, মুহাদ্দিস আল্লামা আশরাফুজ্জমান আল-কাদেরী, প্রধান মুহাদ্দিস মাওলানা জসিম উদ্দিন আল আজহারী, আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আতের প্রেসিডিয়াম সদস্য আল্লামা নুর মোহাম্মদ আলকাদেরী, অধ্যক্ষ মাওলানা বদিউল আলম রিজভী, সার্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন আজহারী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ মুরশেদুল হক। শেরে মিল্লাত কন্ফারেন্স প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ও সদস্য সচিব মাওলানা আবদুল মালেকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত কনফারেন্স-এ অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, প্রবীন আলেম মাওলানা আবুল হাশেম শাহ, মাওলানা হোসাইন আহমদ ফারুকী, মাওলানা গোলাম মোস্তফা মোহাম্মদ নুরুন্নবী, আল আমীন বারিয়া কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আল্লামা ইসমাইল নোমানী, উপাধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল আজিজ আনোয়ারী, মাওলানা সোলাইমান চৌধুরী, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ড. মাওলানা আনোয়ার হোসেন, ফয়জুল বারী মাদরাসার উপাধ্যক্ষ ড. মাওলানা খলিলুর রহমান, মাস্টার সৈয়দ আবদুল মান্নান, অধ্যক্ষ মাওলানা ড. সরওয়ারুদ্দিন, উপাধ্যক্ষ মাওলানা ড. সাইফুল আলম, অধ্যাপক মাওলানা ইলিয়াছ আলকাদেরী,

মাওলানা ফজলুল কবির চৌধুরী। সম্মানিত অতিথি হিসাবে ছিলেন, আনজুমান-এ রাহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিযা ট্রাস্ট’র অ্যাসিস্টেন্ট জয়েন্ট সেক্রেটারি আলহাজ্ব মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন সাকের, গাউসিয়া কমিটির মহাসচিব শাহজাদ ইবনে দিদার, যুগ্ম মহাসচিব আলহাজ্ব মাবুবুল হক খান, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সভাপতি ও আনজুমান সদস্য আলহাজ্ব কমরুদ্দিন সবুর, আহলে সুন্নত ওয়াল জমা’আত কেন্দ্রীয় অর্থ সচিব অ্যাডভোকেট মোখতার আহমদ, আল্লামা নঈমী (র.) এর ছাহেবজাদা মাওলানা কলিম উল্লাহ, হাবিব উল্লাহ শাহেদ, মাওলানা হামেদ রেজা নঈমী ও মাওলানা কাসেম রেজা নঈমী।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ আবু তাহের, মাওলানা আলাউদ্দিন আলকাদেরী, মাওলানা ইউনুছ রিজভী, মাওলানা সাইফুদ্দিন আল আজহারী, মাওলানা নঈমুল হক নঈমী, গাউসিয়া কমিটি মহানগর শাখার আলহাজ্ব মাহবুব আলম, মনোয়ার হোসেন মুন্না, আলহাজ্ব খায়র মুহাম্মদ, আলহাজ্ব মুনির উদ্দিন সোহেল, উত্তর জেলার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাস্টার জমির উদ্দিন, উত্তর জেলার সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, দক্ষিণ জেলার সহ-সভাপতি আলহজ্ব নেজাবত আলী বাবুল, সাধারণ সম্পাদক মাস্টার হাবিব উল্লাহ, গাউসিয়া কমিটি উত্তর জেলার প্রচার সম্পাদক আহসান হাবীব চৌধুরী হাসান, গাউসিয়া কমিটি মিডিয়া সেল প্রধান অধ্যক্ষ আবু তালেব বেলাল, সদস্য এরশাদ খতিবী, আবু নাছের মুহাম্মদ তৈয়ব আলী, মিনহাজুল আবেদীন, মাওলানা মোহাম্মদ শাহ আলম প্রমূখ।

বলুয়ারদীঘি খানকাহ শরীফ

শেরে মিল্লাত স্মারক আলোচনায় বক্তারা বলেন, আল্লামা মুফতি ওবায়দুল হক নঈমী (রহ.) যুগশ্রেষ্ঠ শায়খুল হাদীস, মুফতি, মুফাচ্ছির হওয়া সত্ত্বেও আপন পীর মুরশিদ ও সিলসিলার খেদমতে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে গেছেন। বক্তারা, হুজুর কিবলার খেদমত থেকে বিচ্যুতি না হতে নিজ মৃত সন্তানের জানাযায় পর্যন্ত যাননি উল্লেখ করে আল্লামা নঈমীকে ফানা-ফির-রাসুল (দ.) ও ফানা ফিশ- শায়খ' বলেও মতপ্রকাশ করেন।

দরবারে আলীয়া কাদেরিয়ার প্রতি তাঁকে ওয়াফাদারীর একক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে হুজুর কিবলা গাউসে জামান তাহের শাহ মুদ্দাযিল্লুহুল আলী তার প্রতি মাশায়েখ হযরাতে কেরাম সন্তুষ্ট বলে মন্তব্য করে ছিলেন তাঁর ইন্তেকালের পর।

বক্তারা বলেন, শেরে মিল্লাত নঈমী (রহ.) ইসলামের মূলধারা সুন্নিয়াতের আলো মানুষের দ্বারে-দ্বারে পৌঁছাতে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন, তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইসলামের নামে-বেনামে ছদ্মবেশী সকল বাতুলতার বিরুদ্ধে পবিত্র কুরআন -হাদিস, ফিকাহ- ফতোয়ার জ্ঞানগর্ভ ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে মানুষের ঈমান-আক্বিদা রক্ষায় ময়দানে তিনি যেমন সোচ্চার ছিলেন তেমনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আত বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান হিসেবে সাংগঠনিকভাবেও তার মোকাবিলায় অগ্রণী ভুমিকা রেখে গেছেন। তাঁর অগণিত ছাত্র দুনিয়ার দেশে- দেশে দ্বীনি খেদমত আনজাম দিচ্ছে উল্লেখ করেন আল্লামা নঈমীকে দ্বীন মাযহাব-মিল্লাতের এক অনন্য সিপাহসালার মন্তব্য করে তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ অনুসরণের আহবান জানান বক্তারা।

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়ার শায়খুল হাদীস, শেরে মিল্লাত মুফতি ওবায়দুল হক নঈমী (রহ.)'র ১ম তফাত বার্ষিকী উপলক্ষে নগরীর বলুয়ারদীঘি পাড়স্থ খানকাহ-এ কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া শরীফে স্মারক আলোচনায় বক্তারা উপরোক্ত আহবান জানান। খানকাহ শরীফের মোতায়াল্লী সদস্য আলহাজ্ব নেওয়াজ আহমদ দুলালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও প্রধান আলোচক ছিলেন আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র সি.ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন ও জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া'র অধ্যক্ষ আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ অসিয়র রহমান আলকাদেরী। অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ও বিশেষ আলোচক ছিলেন, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ কমিশনার ও যুগ্ম মহাসচিব আলহাজ্ব এড. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার।

মরহুম আলহাজ্ব নূর মোহাম্মদ সওদাগর আল-কাদেরী (রহ.) স্মৃতি সংসদ'র জেনারেল সেক্রেটারী মুহাম্মদ এরশাদ খতিবীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নেন- আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আত বাংলাদেশ'র প্রেসিডিয়াম সদস্য আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদ্রাসার প্রভাষক মাওলানা মুহাম্মদ কাশেম রেযা নঈমী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়ার শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মদ নঈমুল হক নঈমী, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা গাউসিয়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হাবীব উলাহ মাষ্টার, মাসিক তরজুমান’র

সহ-সম্পাদক আবু নাছের মুহাম্মদ তৈয়ব আলী, চট্টগ্রাম মহানগর গাউসিয়া কমিটির সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব সাবের আহমদ, আলহাজ নূর আহমদ পিন্টু, আলহাজ্ব সিদ্দিক আহমদ, মুহাম্মদ মহি উদ্দিন, হাফেজ আবুল হোসাইন, শায়ের মুহাম্মদ সাকিব কাদেরি প্রমুখ।

পরিশেষে, মিলাদ- কেয়াম, মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

রাঙ্গামাটি জেলা গাউসিয়া কমিটি

আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আত চেয়ারম্যান ও জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসার শাইখুল হাদিস শেরে মিল্লাত মুফতি ওবায়দুল হক নঈমী'র বার্ষিক ওরশ শরীফ উপলক্ষে শেরে মিল্লাত কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বিকেলে রাঙামাটিস্থ খানকাহ্-এ কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়বিয়ায় অনুষ্ঠিত কনফারেন্সের আয়োজন করে রাঙামাটি জেলা গাউসিয়া কমিটি। এতে বক্তারা বলেন, ইসলাম বিকৃতকারীরা দেশ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরোধী। দেশের অগ্রযাত্রায় এরাই সবসময় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তারা একদিকে যেমন ইসলামের শত্রু তেমনি দেশেরও শত্রু। এদের মোকাবেলায় শেরে মিল্লাত শাইখুল হাদিস ওবায়দুল হক নঈমীর আদর্শ অনুসরণ করা জরুরী। বক্তারা আরো বলেন, ইসলামের মুলধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আতের প্রচার-প্রসারে শেরে মিল্লাতের ভুমিকা অপরিসীম। ইসলাম বিকৃতকারীদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সবসময় সোচ্চার। জেলা গাউসিয়া কমিটির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মাওলানা শফিউল আলম আল ক্বাদেরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ইমাম সমিতি রাঙামাটি জেলা সভাপতি মাওলানা ক্বারী ওসমান গনি চৌধুরী, তৈয়বিয়া আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মোহাম্মদ আখতার হোসেন চৌধুরী, রিজার্ভ বাজার জামে মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা নঈম উদ্দিন আল ক্বাদেরী, মোহাম্মদ আলমগীর, মোহাম্মদ মনসুর আলী, খানকা শরীফের তত্তাবধায়ক হাফেজ মোহাম্মদ মফিজুল হক প্রমুখ।

সাতকানিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া জিন্নাত আরা সুন্নিয়া মাদরাসা

সাতকানিয়া উপজেলার গাউসিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া জিন্নাত আরা সুন্নিয়া মাদরাসায় আলে রসূল হযরত সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.) ও শেরে মিল্লাত মুফতি আল্লামা ওবাইদুল হকনঈমী (রহ.)র স্মরণসভা ও অভিভাবক সমাবেশ গত ২২ জুন মাদরাসা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মাওলানা মুহাম্মদ মাহাবুবুর রহমান, প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি সাতকানিয়া উপজেরা শাখার উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ ফিরোজ আলম চৌদুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি সাতকানিয়া উপজেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ সাইফুদ্দীন। আরো উপস্থিত ছিলেন ফোরকান আহমদ, হেলাল উদ্দীন, মাওলানা মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন ও হাকেম মুহাম্মদ ইউসুফ।

বেটারীগলি ইউনিট গাউসিয়া কমিটি

গাউসিয়া কমিটি কোতোয়ালী থানাধীন বাগমনিরাম ওয়ার্ড বেটারিগলি ইউনিট শাখার উদ্যোগে স্থানীয় বায়তুন নুর জামে মসজিদে আল্লামা সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.) ও শায়খুল হাদিস শেরে মিল্লাত মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী (রহ.)'র ওরস মোবারক স্মরণে মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে তকরির করেন আল্লামা মীর মুহাম্মদ আলাউদ্দিন, ইউনিট সভাপতি বেলাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক হামিদ উল্লাহ, ওয়ার্ড গাউসিয়া কমিটি সভাপতি গোলাম মোস্তফা এতে সভাপতিত্ব করেন।

গাউসিয়া কমিটির সাংগঠনিক তৎপরতা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র বৃক্ষরোপন কর্মসূচির উদ্বোধন

আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র অংগ সংগঠন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পরিষদ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনে সারাদেশে দু'লক্ষাধিক বৃক্ষচারা রোপণের কর্মসূচি ঘোষণা করে। গত ২৮ জুন সোমবার সকালে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া ময়দানে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র সি. ভাইস-প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন। এ উপলক্ষে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন, আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র অংগ সংগঠন হিসেবে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চলমান মহামারী করোনাকালে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বসাধারণের মৃত দেহ গোসল- কাফন-

দাফন- সৎকার, ফ্রি অক্সিজেন সরবরাহ্, রোগী ও লাশ পরিবহনে ফ্রি এম্বুল্যান্স সার্ভিসসহ সারাদেশে পরিচালিত মানবিক সেবা কার্যক্রম সত্যিকারার্থে উদারনৈতিক সুফিবাদী ইসলামের বার্তাই বহন করে। তিনি দেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে কেন্দ্র করে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি পালনের জন্যে গাউসিয়া কমিটির সফলতা কামনা করেন।

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ কমিশনারের সভাপতিত্বে বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষ চারা বিতরণ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়ার অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অসিয়র রহমান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেণ গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রীয় যুগ্ম-মহাসচিব ও করোনা রোগীসেবা ও কাফন-দাফন কর্মসূচি প্রধান সমন্বয়ক আলহাজ্ব এড. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার। কর্মসূচির সদস্য আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ'র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম উওর জেলার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আলহাজ্ব জমির উদ্দীন মাষ্টার, দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক হাবিব উল্লাহ মাষ্টার, মদীনা শরীফ শাখার উপদেষ্টা আলহাজ্ব মাওলানা করিম উদ্দিন নূরী, উওর জেলার প্রচার সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ আহসান হাবীব চৌধুরী হাসান, কেন্দ্রীয় মিডিয়া সেল সদস্য মুহাম্মদ এরশাদ খতিবী, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক, মাওলানা মুহাম্মদ আবুল হাশেম প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে গাউসিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ কমিশনার গাউসিয়া কমিটির সর্বস্তরের শাখা কমিটিকে সরকারি-বেসরকারী প্রশাসনের সহযোগিতায় বৃক্ষ রোপণ ও পরিচর্যার মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষার প্রত্যক্ষ ভূমিকায় মানবতার খেদমতে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র চট্টগ্রাম মহানগর-উত্তর-দক্ষিণ জেলার মাঝে চারা বিতরণ ও জামেয়া ময়দানে ওষুধী, ফলজ, কাষ্টল জাতীয় তিনটি চারা রোপণ করেন প্রধান অতিথি ও অতিথিবর্গ। অনুষ্ঠান শেষে দেশ- জাতির কল্যাণে দোয়া মুনাজাত করেন- জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়ার অধ্যক্ষ আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ অসিয়র রহমান আল কাদেরী।

চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকের সাথে গাউসিয়া কমিটির বৈঠক

চলমান করোনা মহামারীর ৩য় ঢেউ মোকাবিলার প্রস্তুতি বিষয়ে চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক ডা. হাসান শাহরিয়ার কবিরের সাথে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় গত ৬ জুলাই দুপুরে। কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ কমিশনারের নেতৃত্বে বৈঠকে করোনা মহামারীর শুরু থেকে অদ্যাবধি গণ মানুষের প্রতি প্রদানকৃত মানবিক সেবা কর্মকান্ড ও চলমান ৩য় ঢেউ মোকাবিলায় প্রস্তুতি বিষয়ে গাউসিয়া কমিটির কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন- সংঠনের যুগ্ম-মহাসচিব ও করোনা রোগীসেবা, মৃত কাফন-দাফন কর্মসূচির প্রধান সমন্বয়ক আলহাজ এড. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার।

বিগত ২০২০ সালের মার্চে বাংলাদেশে করোনা মহামারীর শুরু থেকে ভীতিকর পরিস্থিতিতে জীবনবাজি রেখে চট্টগ্রামসহ সারাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে গাউসিয়া কমিটির সম্পূর্ণ ফ্রি ও বিনামূল্যে করোনা রোগীর লাশ গোসল-কাফন-দাফন-সৎকার সহায়তা, অক্সিজেন সাপ্লাই, এম্বুল্যান্স সার্ভিস, চিকিৎসাসেবা, কয়েক লক্ষ পরিবারে খাদ্য সামগ্রী সহায়তা, দু'লক্ষ বৃক্ষ চারা রোপণের ইত্যাদি মানবতার সেবায় নিবেদিত সামাজিক কর্মকান্ডের বিবরণ দেন তিনি।

স্বাস্থ্য পরিচালক ডা. হাসান শাহরিয়ার কবির বেসরকারি পর্যায়ের অংশ গ্রহণ ছাড়া এ রকম দুর্যোগ মোকাবিলা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয় উল্লেখ করে তিনি চট্টগ্রামে করোনাকালে মানবিক সেবা কর্মসূচির মাধ্যমে দেশ-জাতি ও গণ মানুষের প্রতি অবদানের জন্যে গাউসিয়া কমিটির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি করোনার চলমান ৩য় ঢেউ মোকাবিলায় গাউসিয়া কমিটির গৃহীত পরিকল্পনায় সন্তোষ প্রকাশ করে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

মহামারী করোনার ৩য় ঢেউ মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় গাউসিয়া কমিটির প্রস্তুতি

বাংলাদেশে করোনা মহামারীর তৃতীয় ঢেউ মোকাবিলায় গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পরিষদ পরিচালিত করোনা রোগীসেবা ও মৃত কাফন-দাফন কর্মসূচির এক জরুরী সভা কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ কমিশনারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। মহাসচিব আলহাজ্ব শাহজাদ ইবনে দিদার'র সঞ্চালনায় চলমান করোনাকালীন মানবিক সেবা কর্মসূচির অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

উপস্থাপন করেন কর্মসূচির প্রধান সমন্বয়ক আলহাজ এড. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার। আলোচনায় অংশ নেন - কর্মসূচির সদস্য আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, আলহাজ্ব আহসান হাবীব চৌধুরী হাসান, মুহাম্মদ এরশাদ খতিবী, করোনা তথ্যকেন্দ্র সহকারী মুহাম্মদ মহিউদ্দিন, ওমর ফারুক, মুহাম্মদ মুনির হোসেন, মুহাম্মদ মহসিন, গাজী মাসুদ রানা, আরিফ হোসেন লিমন প্রমুখ।

সভায় গাউসিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ কমিশনার দেশে ক্রমবর্ধমান করোনা সংক্রমণে উদ্বেগ প্রকাশ করে গাউসিয়া কমিটির সর্বস্তরের কর্মীদের মানবতার খেদমতে আরো বেশি এগিয়ে আসার আহবান জানান। তিনি করোনার চলমান ৩য় ঢেউ মোকাবিলায় গাউসিয়া কমিটির ঢাকা -চট্টগ্রামের মানবিক সেবা কর্মকান্ডে আরো ২টি অত্যাধুনিক এম্বুল্যান্স যোগ হচ্ছে উল্লেখ করে পরিবেশ রক্ষায় দেশব্যাপী দু'লক্ষাধিক বৃক্ষ চারা রোপণ কর্মসূচি চলতি বর্ষা মৌসুমে সফল করতেও কর্মীদের নির্দেশ দেন।

সৈয়দপুরে গাউসিয়া কমিটির নতুন অফিস উদ্বোধন

গাউসিয়া কমিটির সদস্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ উত্তরবঙ্গের সৈয়দপুর শহরে গাউসিয়া কমিটির নতুন অফিস গত ১৮ জুন শুভ উদ্বোধন হয়। অফিসটি সৈয়দপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র শহিদ জহুরুল হক রোড, কলিম মোড় সংলগ্ন, হক টাওয়ারের তয় তলায় অবস্থিত। এ্যাডভোকেট হাসনেন ইমাম সোহেলের সভাপতিত্বে ও শাহেদ আলী কাদেরির সঞ্চালনায় উদ্বোধন অনুষ্ঠান উদ্বোধন কিরা হয়। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রিয় গাউসিয়া কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাডভোকেট রিদওয়ান আশরাফি, অধ্যাপক আব্দুর রউফ, অধ্যাপক সৈয়দ ফযলুর রহমান নাসিম, আলহাজ আলী ইমাম, সৈয়দ আব্দুল্লাহ বখশীসহ সংগঠনের অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।

উল্লেখ্য, গতবছর সৈয়দপুর শহরে গাউসিয়া কমিটি একমাত্র সংগঠন হিসেবে করোনায় মৃত ব্যক্তির গোসল-জানাযা-দাফন কাজ সম্পন্ন করে এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে উপজেলা পর্যায়ে সম্মাননা স্মারক অর্জন করে।

কলাউজান ইউনিয়ন শাখার আহবায়ক কমিটি গঠিত

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ লোহাগাড়া উপজেলা শাখার আওতাধীন কলাউজান ইউনিয়ন শাখা গঠননকল্পে এক সভা গত ১০ জুন সকাল ১০ ঘটিকায় চট্টগ্রাম ষোলশহরস্থ আলমগীর খানকাহ শরিফে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ লোহাগাড়া উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ জসিম উদ্দীন আলকাদেরী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সহ সভাপতি আলহাজ্ব নেজাবত আলী বাবুল, বিশেষ অতিথি ছিলেন দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব হাবিবুল্লাহ মাষ্টার ও সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব মোজাফফর আহমদ।

সভায় মাওলানা সিরাজুল ইসলাম কে আহ্বায়ক, মাওলানা মুহাম্মদ আবুল হাশেম ও হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম কে যুগ্ম-আহবায়ক, হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন কে সদস্য সচিব, হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আইয়ুব আলী কে যুগ্মসচিব, হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ কে অর্থসচিব, হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম কে সহ-অর্থ সচিব এবং হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল আমিন, হাফেজ মুহাম্মদ কুতুব উদ্দীন, হাফেজ মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন, হাফেজ মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, হাফেজ মুহাম্মদ আব্দুল জব্বার ও হাফেজ মুহাম্মদ আব্দুন নুর কে সদস্য করে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি গঠিত হয়।

দ্বীপকালা মোড়ল ইউনিট শাখা গঠন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কর্ণফুলী থানা শাখার আওতাধীন শিকলবাহা ওয়ার্ডের ১নং দ্বীপকালা মোড়ল ইউনিট শাখা গঠন ও কুতুবুল আউলিয়া আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.)'র বার্ষিক ফাতেহা শিকলবাহা ওয়ার্ডের সহ সবাপতি মুহাম্মদ তৈয়্যব সওদাগরের সভাপতিত্বে গত ২৫ জুন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি কর্ণফুলী থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইলিয়াছ মুন্সি, প্রধান বক্তা ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নুর মুহাম্মদ আলকাদেরী, বিশেষ বক্তা ছিলেন সহ সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইমতিয়াজ উদ্দীন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ খোরশেদ আলম, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মুহাম্মদ সুমন। আরো উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান নুরী, মাওলানা মুহাম্মদ কাইয়ুম উদ্দীন।

এতে সর্বসম্মতিক্রমে মুহাম্মদ আলী আহমদ চৌধুরীকে সভাপতি ও মাসুক আহমদকে সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আবু শাহেদকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ৪১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়। মুহাম্মদ রবি আলী সারাংকে প্রধান উপদেষ্টা করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়।

পাহাড়তলী থানা শাখার দাওয়াতে খায়র মাহফিল

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পাহাড়তলী থানা শাখার উদ্যোগে দাওয়াতে খায়র মাহফিল গত ২০ জুন বাদ মাগরিব হাজী আবদুল আলী জামে মসিজদ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। দাওয়াতে খায়র বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন থানা দাওয়াতে খায়র সম্পাদক মাহমুদ খাঁন জামে মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা আবদুল হালিম। উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন, হাজী মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, কাজী মুহাম্মদ আবদুল হাফেজ, নাঈমুল হাসান তানভীর, আ.ফ.ম মঈন উদ্দীন, মুহাম্মদ ইলিয়াছ, মুহাম্মদ আজিজুর রহমান, মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম জিকু, মুহাম্মদ মনির হোসেন, মুহাম্মদ হাসান, মুহাম্মদ আবদুর রশিদ প্রমুখ। দাওয়াতে খায়র সম্পাদক মাওলানা আবদুল হালিম নামাজ ও গোসল নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেন।

১২নং ওয়ার্ড শাখার মাসিক সভা ও দাওয়াতে খায়র মাহফিল

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ১২নং ওয়ার্ড শাখার মাসিক সভা ও দাওয়াতে খায়র মজলিস সংগঠণের সাধারণ সম্পাদক হাজী মুহাম্মদ ইউছুপ আলীর সঞ্চালনায় ১২নং ওয়ার্ড শাখার সভাপতি মুহাম্মদ আলাউদ্দিন খাঁন এর সভাপতিত্বে ভেলুয়ার দিঘী শাহী জামে মসজিদের ২য় তলায় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন, সিনিয়র সহ-সভাপতি- মুহাম্মদ মাসুদ মিয়া, পাহাড়তলী বাজার ষ্টেশন রোড ইউনিট শাখার সভাপতি- মুহাম্মদ শাহাব উদ্দিন, পশ্চিম নাছিরাবাদ ইউনিট শাখার অর্থ-সম্পাদক মুহাম্মদ জয়নাল আবেদিন, ঝর্ণাপাড়া ইউনিট শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ফজল হক ফারুক, ঈদগাহ ইউনিট শাখার সহ-সভাপতি মুহাম্মদ নাসির,পদ্মপুকুর ইউনিট শাখার সভাপতি মুহাম্মদ নুরুল হক খোকন এবং সেকান্দর মিয়া, মুহাম্মদ আজিজুর রহমান, মুহাম্মদ নিজাম প্রমুখ। দাওয়াতে খায়র বিষয়ে আলোচনা করেন ভেলুয়ার দিঘী শাহী জামে মসজিদের খতিব হযরত মাওলানা মুখতার আহমদ আল-ক্বাদেরি।

শোক সংবাদ

আলহাজ্ব মকবুল আহমদ

গাউসিয়া কমিটি রাউজান উপজেলা উত্তরের সহ-সভাপতি, ৭নং রাউজান সদর ইউনিয়নের সাবেক মেম্বার আলহাজ্ব মকবুল আহমদ (৭৪) গত ১৮ জুন নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না----রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৬ ছেলে, ৪ মেয়ে, নাতি-নাতনি সহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রেখেযান। ১৯ জুন মরহুমের নামাজে জানাজা শনিবার সকাল ১১ টায় পূর্ব রাউজান শামসুন নগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। নামাজে জানাযায় ইমামতি করেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান। মরহুমের ইন্তেকালে গাউসিয়া কমিটি চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সভাপতি আলহাজ্ব জমির হোসেন মাষ্টার, সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আহসান হাবিব চৌধুরী হাসান, রাউজান উপজেলা উত্তরের সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা ইলিয়াস নুরি, সাধারন সম্পাদক ইয়াসিন হোসাইন হায়দরি গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং শোকাহত পরিবার পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

মেহেরাজ খাতুন

গাউসিয়া কমিটি পটিয়া উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম চৌধুরী শামীমের মাতা মোছাম্মৎ মেহেরাজ খাতুন (৮৬) গত ২২ জুন বিকাল ৩টায় চট্টগ্রাম নগরীর বাকলিয়াস্থ বাসভবনে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না--রাজেউন)। মৃত্যুকালে তিনি ৪ ছেলে, ৮ মেয়ে, নাতী-নাতনী সহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রেখেযান। মরহুমার নামাজে জানাযা পরদিন ১০টায় পটিয়া আজিমপুর আলী আকবর চৌধুরী জামে মসজিদ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। মরহুমার ইন্তেকালে গাউসিয়া কমিটি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সভাপতি আলহাজ্ব কমর উদ্দিন সবুর, সাধারন সম্পাদক হাবিব উল্লাহ

মাস্টার, পটিয়া উপজেলা সভাপতি মাহবুবুল আলম, পৌরসভার সভাপতি কাজী আবু মহসিন, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম শোক প্রকাশ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

সিরাজ খাতুন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ সৌদি আরব রিয়াদ শাখার উপদেষ্টা আলহাজ্ব মুহাম্মদ শাহাব উদ্দিনের মাতা, আলহাজ সিরাজ খাতুন (৭৮) ১৫ জুন মঙ্গলবার বিকাল- ৩-৩০ মিনিটের সময় নগরীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না--রাজেউন)। মৃত্যুকালে তিনি ৫ ছেলে, ৪ মেয়ে, নাতী নাতনী সহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুনগ্রাহী রেখেযান। মরহুমার ইন্তেকালে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ, মহাসচিব শাহজাদ ইবনে দিদার, যুগ্ম মহাসচিব এডভোকেট মোসাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, চট্টগ্রাম উত্তর জেলার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাস্টার জমির, সাধারন সম্পাদক এডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী শোক প্রকাশ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

খায়ের আহমদ সওদাগর

গাউসিয়া কমিটি বোয়ালখালী উপজেলার উপদেষ্টা খায়ের আহমদ সওদাগর (৭৫) ১৯ জুন শনিবার দুপুর ১২.৩০টায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্না...রাজেউন)। মাত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ ছেলে, ৩ মেয়ে, নাতি-নাতনী সহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রেখেযান। ঐদিন রাত ৯টায় সৈয়দপুর তৈয়্যবিয়া কমপ্লেক্স ময়দানে মরহুমের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। মরহুমের ইন্তেকালে গাউসিয়া কমিটি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সভাপতি আলহাজ্ব কমর উদ্দিন সবুর, সাধারণ সম্পাদক হাবিব উল্লাহ মাষ্টার, বোয়ালখালী উপজেলার সভাপতি নুরুল ইসলাম মুন্সি, সাধারণ সম্পাদক মমতাজুল ইসলাম, তৈয়্যবিয়া কমপ্লেক্স পরিচালনা কমিটির সভাপতি নাছির উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক শেখ সালাউদ্দিন শোক প্রকাশ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

দিলআরা বেগম

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সাবেক সভাপতি অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা আবদুস সবুর চৌধুরীর সহধর্মিণী সমাজসবিকা আলহাজ্বা দিল আরা বেগম (৬৩) চট্টগ্রামের একটি বেসরকারী হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না--রাজেউন) মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, ৪ ছেলে, ২ মেয়ে, নাতী-নাতনী সহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রেখেযান। মরহুমের নামাজের জানাযা ১৩ জুন, উত্তর হাশিমপুর সৈয়দাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। মরহুমের ইন্তেকালে আনজুমান ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস- প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন, সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বাংলাদেশের চেয়ারম্যান আল্লামা কাযী মঈনুদ্দিনআশরাফী, কো-চেয়ারম্যান মাওলানা হাফেজ সোলাইমান আনছারী, নিবার্হী মহাসচিব মাওলানা আবুল কাশেম মুহাম্মদ ফজলুল হক, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ, মহাসচিব শাহজাদ ইবনে দিদার, যুগ্ম মহাসচিব এডভোকেট মোসাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, গাউসিয়া কমিটি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সভাপতি আলহাজ্ব কমর উদ্দিন সবুর, সাধারন সম্পাদক হবিব উল্লাহ মাস্টার শোক প্রকাশ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

মোহাম্মদ আলী

গাউসিয়া কমিটি চন্দনাইশ পৌরসভা দক্ষিণ জোয়ারা জিহস ফকির পাড়া শাখার নির্বাহী সদস্য মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিনের পিতা সমাজসেবক মোহাম্মদ আলী (৭৫) গত ৫ জুলাই নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্না-রাজেউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৪ ছেলে, ১ মেয়ে, নাতী-নাতনী সহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রেখেযান। মরহুমার নামাজের জানাযা ৬ জুলাই স্থানীয় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে গাউসিয়া কমিটি চন্দনাইশ পৌরসভার সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা সোহাইল উদ্দিন আনসারীর ইমামতিতে অনুষ্ঠিত হয়। মরহুমার ইন্তেকালে শোক প্রকাশ করেছেন গাউসিয়া কমিটি চন্দনাইশ পৌরসভা সভাপতি মেজবাহ উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক মোরশেদুল আলম, শোক প্রকাশ করেন এবং শোকাহত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

নূর সওদাগর (রহ.)'র ইছালে সওয়াব মাহফিল

তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া নূর সওদাগর-জয়নাব বেগম সুন্নীয়া মাদ্রাসা, হেফজ ও এতিমখানার প্রতিষ্ঠাতা, এম.এন গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মুহাম্মদ নূর সওদাগর (রহ.)'র ইছালে

সাওয়াব উপলক্ষে খতমে বোখারী ও মিলাদুন্নবী (দ.) মাহফিল গত ২৫ জুন অনুষ্ঠিত হয়। এম.এন গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মদ নূর সোবহান চৌধুরীর সভাপতিত্বে পটিয়া পাঁচরিয়া তাহেরিয়া-সাবেরিয়া নূর সওদাগর সিটি জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আন্‌জুমান ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন। বক্তব্য রাখেন আনজুমান রিসার্চ সেন্টারের মহা-পরিচালক আল্লামা এম.এ মান্নান, আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আত বাংলাদেশের চেয়ারম্যান আল্লামা কাজী মঈন উদ্দিন আশরাফী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া কামিল মাদ্রাসার শায়খুল হাদিস আলহাজ্ব মাওলানা মুফতি সোলাইমান আনছারী, প্রধান ফকিহ্ আল্লামা মুফতি আব্দুল ওয়াজেদ, মুহাদ্দেস আল্লামা হাফেজ আশরাফুজ্জামান আলকাদেরী। উপস্থিত ছিলেন ছোবহানিয়া আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি হারুনুর রশিদ আলকাদেরী, মুহাদ্দিস মাওলানা জসিম উদ্দিন আজহারী, আরবী প্রভাষক মাওলানা আবুল হাসেম শাহ, মাওলানা আবু তাহের, উপাধ্যক্ষ জুলফিকার আলী চৌধুরী, মাওলানা গাজী আবুল কালাম বয়ানী, মাওলানা জালাল উদ্দিন আযহারী, নূর সোপ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক মুহাম্মদ নূর আলি চৌধুরী, মুহাম্মদ নূর রহমান চৌধুরী, এম.এন. ট্রাস্টের পরিচালক মুহাম্মদ নূর রায়হান চৌধুরী প্রমুখ।